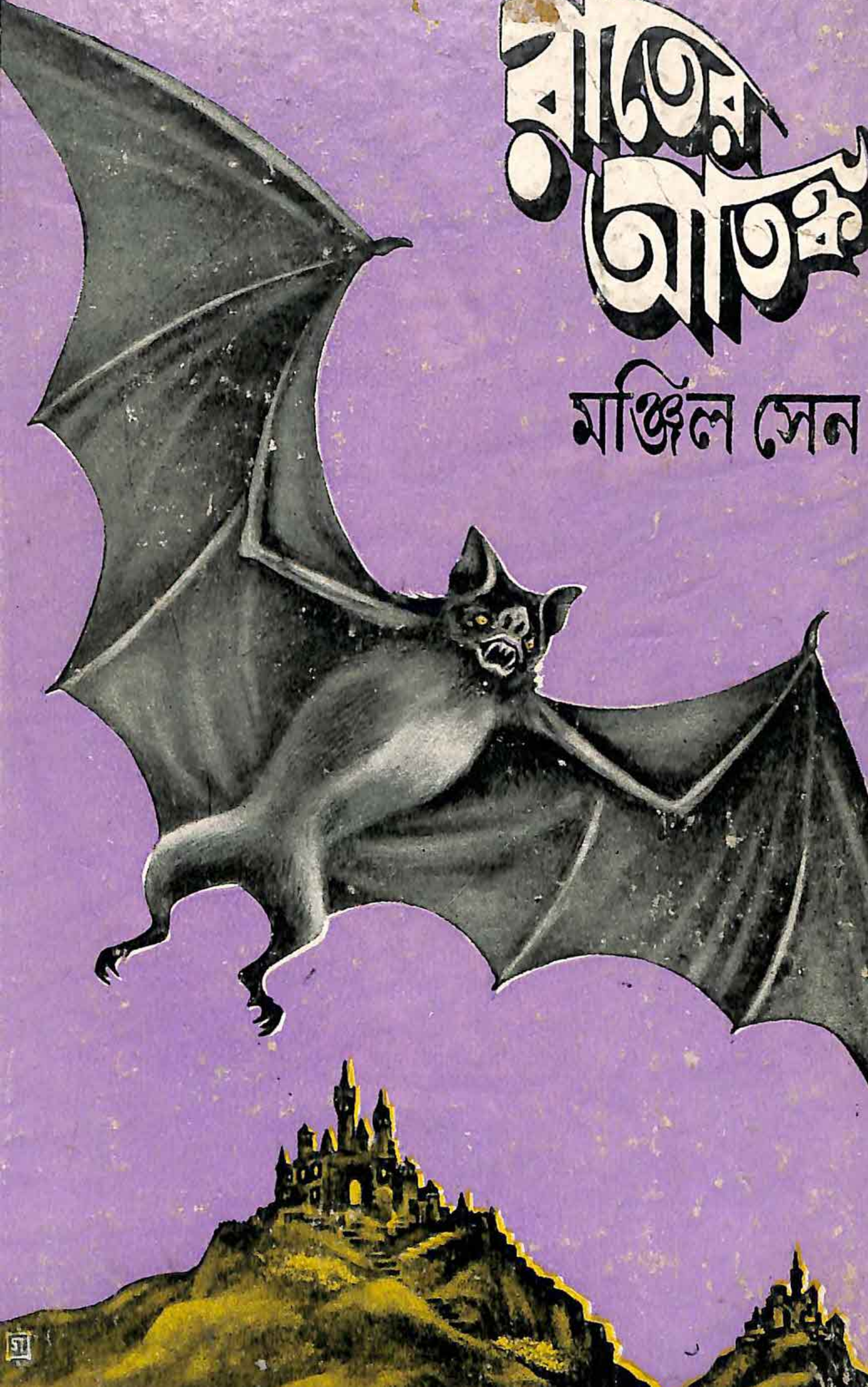
রাতের আতঙ্ক

মঞ্জিল সেন



রাতের আতঙ্ক

মঞ্জিল সেন

বি ম লা র ঞ্জ ন প্র কা শ ন
৮/১সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

শুভ রথযাত্রা
১ম প্রকাশ আষাঢ়, ১৩৮৫ সাল
২য় প্রকাশ আষাঢ়, ১৩৯৩ সাল

প্রকাশক
বিমলারঞ্জন চন্দ্র
বিমলারঞ্জন প্রকাশন
৮/১সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা—৭০০০৭৩

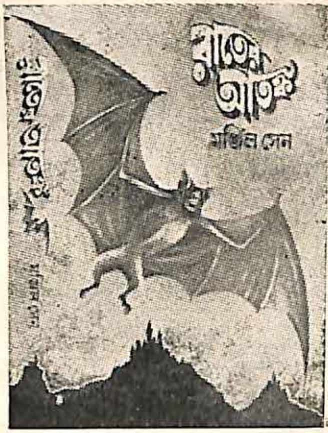
মুদ্রক
সনাতন হাজরা
প্রভাবতী প্রেস
৬৭, শিশির ভাদুড়ী সরণী,
কলিকাতা—৭০০০০৬

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
গণেশ বসু

মূল্য : নয় টাকা মাত্র

উৎসর্গ

রঞ্জু, ডালু ও গৌতমকে—


রাতের আতঙ্ক
মঞ্জিল সেন

রাতের আতঙ্ক

বাল্যবন্ধু অরুণের চিঠিটা আমি মনোযোগ দিয়ে পড়ছিলাম। ও লিখেছে ঃ

প্রিয় সুব্রত,

আমার এই চিঠিটা পেয়ে তুই হয়তো আশ্চর্য হয়ে যাবি, হঠাৎ তোকে চিঠি লিখলাম কেন ? কলকাতা শহরের হট্টগোলের বাইরে যে কি সুন্দর একটা জগৎ আছে, তা তুই কল্পনাই করতে পারবি না। পাহাড় আর বনময় পরিবেশে আমাদের এই জায়গাটা এক কথায় নন্দন-কানন। কিছুদিনের জন্য এখানে চলে আয়, তুই মুগ্ধ হয়ে যাবি। বুনো হাঁস আর শিকার প্রচুর মিলবে। তোর শিকারের নেশা প্রাণভরে মেটাতে পারবি। তাছাড়া রহস্যের গন্ধ পেলে তুই তো আর কিছু চাস না। তাও আছে এখানে। বিশদ ভাবে এই চিঠিতে লেখা সম্ভব নয়, এখানে এলেই সব জানতে পারবি। বিশেষ করে এই রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যই তোকে আসতে লেখা। আমি হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি। কবে আসবি জানাস, আমি সব ব্যবস্থা করে রাখব। ভালবাসা জানিস।

ইতি—

অরুণ

পুঃ—এইমাত্র একটা সাংঘাতিক খবর এসেছে, শুনে আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেছি। সে কারণেও তোর একবার আসা প্রয়োজন।

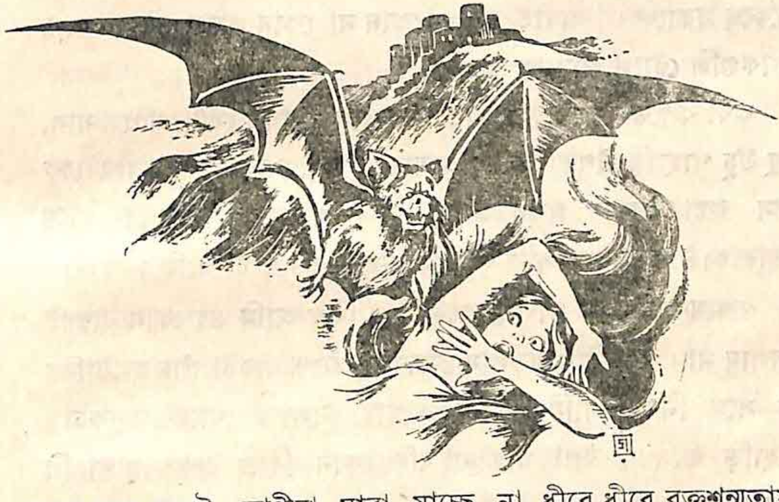
আমি চিঠিটা দু-তিনবার পড়লাম। অরুণ যে ঘোরতর সমস্যায় পড়েছে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ওর চিঠির শেষের দিকে একটা অসহায়তার সুর আমার কানে বেজে উঠল। আমি মনস্থির করে ফেললাম। চিঠির প্যাডটা টেনে নিয়ে খসখস করে লিখে দিলাম কবে রওনা হচ্ছি।

একটা ছোট পাহাড়ি স্টেশনে আমি নামলাম। অরুণ যেন ব্যাগ্রভাবে আমার অপেক্ষা করছিল, আমাকে সে জড়িয়ে ধরল। জীপে চেপে আঁকা-বাঁকা রুক্ষ পাহাড়ি পথ ধরে আমরা চললাম। চারদিকের দৃশ্য এত সুন্দর যে কলকাতার প্রাসাদ-নগরীতে বাস করে আমরা তা কল্পনাও করতে পারব না। যেদিকে দৃষ্টি যায়, শুধু পাহাড় আর পাইন বনের সবুজ শোভা। পথের পাশে বুনো গাছের ঝোপ। লাল নীল হলদে বেগুনি রঙ-বেরঙের সব ফুল ফুটে ঝোপগুলি অপূর্ব দেখাচ্ছে। প্রকৃতি যেন অকৃপণ হাতে সব সৌন্দর্য উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে। ভাল কথা, আমরা যেখানে যাচ্ছি, অরুণ সেই অঞ্চলের থানার দারোগা।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকলে আমি একটা আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে বললাম, এবার তোমার রহস্য-কাহিনী শোনা যাক।

অরুণ আমার মুখোমুখি বসল, তারপর এক চমকপ্রদ কাহিনী শোনাল। ওই অঞ্চলে কিছুদিন ধরে একজনের পর একজন অসুস্থ হয়ে পড়ছে। রোগটা যে কি তা কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না। প্রথমে একটি স্বাস্থ্যবতী মেয়েই এই রোগের কবলে পড়ে। এখানকার অধিকাংশ লোকই পাহাড়ি, শক্ত-সমর্থ চেহারা। দেখতে দেখতে অসুস্থ পুরুষ কি নারীর শরীর শুকিয়ে শাদা হয়ে যাচ্ছে, যেন তাদের শরীরের রক্ত কেউ নিংড়ে নিয়েছে। হাসিখুশি জোয়ান মানুষগুলির অস্বাভাবিক ফ্যাকাশে আর কোটরাগত চক্ষু প্রেতের কথা

মনে করিয়ে দেয়। এই ঘটনায় ওই অঞ্চলে দারুণ আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। পাহাড়িদের বিশ্বাস, কোন অপদেবতা বা পিশাচ এসে তাদের মুলুকে আস্তানা গেড়েছে এবং মানুষের রক্ত শুষে খাচ্ছে। তাদের এ বিশ্বাসের মূলে রয়েছে একটি কারণ। সেটা হল, প্রত্যেক অসুস্থ ব্যক্তির গলায় পাশাপাশি দুটো ক্ষতের চিহ্ন দেখা গেছে। সূক্ষ্ম ক্ষত—যেন কেউ তীক্ষ্ণ অস্ত্রের ধারালো অগ্রভাগ গলায় ফুটিয়ে দিয়েছে। দু-বিন্দু রক্ত জমে আছে সেই ক্ষত দুটোর মুখে। অসুস্থ ব্যক্তিদের তিনজন মারা গেছে, এখন একজন ওই রোগে আক্রান্ত হয়েছে। অবশ্য অসুস্থ



হবার সঙ্গে সঙ্গেই রোগীরা মারা যাচ্ছে না, ধীরে ধীরে রক্তশূন্যতায় ভুগে, শেষ পর্যন্ত রক্তহীন হয়েই তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। অসুস্থ অবস্থায় তারা এমন সব অসংলগ্ন প্রলাপ বকছে, যার কোন মাথা-মুণ্ডু নেই। তবে তাদের চোখে-মুখে একটা নিদারুণ ভয়ের চিহ্ন লক্ষ্য করেছি।

অরুণের বক্তব্য শেষ হলে আমি বেশ কিছুক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করলাম। ব্যাপারটা যে রহস্যময় তাতে সন্দেহ নেই। কোন কিছু নেই, এক একজন জোয়ান পাহাড়ি অসুস্থ হয়ে পড়ছে, অথচ অসুখের

কারণ নির্ণয় করা যাচ্ছে না। দেখতে দেখতে তাদের শরীর পাণ্ডুর হয়ে বীভৎস রূপ নিচ্ছে। তাদের অসংলগ্ন প্রলাপ, মুখে আতঙ্কের চিহ্ন—সব মিলিয়ে ব্যাপারটা যেন ভূতুড়ে দেখাচ্ছে। সবচেয়ে যা আমাকে ভাবিয়ে তুলল, তা হচ্ছে তাদের গলায় সূক্ষ্ম ক্ষতের চিহ্ন। কে বা কারা এই ক্ষতের সৃষ্টি করছে? কেমন করেই বা করছে? সবচেয়ে যা আমার আশ্চর্য লাগল তা হল, একজনের পর একজনের ওই রোগের কবলে পড়া, একসঙ্গে একজনের বেশি কখনো অসুস্থ হয় নি। কেন?

অরুণকে প্রশ্ন করে জানতে পারলাম, সব ক'টা ক্ষেত্রেই রোগ ধরা পড়েছে সকালে। অর্থাৎ রাত্রে কোন না কোন সময়ে ওই হতভাগ্য লোকগুলি রোগে আক্রান্ত হয়েছে।

কথা বলতে বলতে বেশ রাত হয়ে গেল। যদিও সেটা এপ্রিল মাস, তবু উঁচু পাহাড়ি উপত্যকাবলে আমার বেশ শীত করছিল। শরীরটাকে গরম করার জন্য আমি একটা চুরুট ধরালাম, তারপর গায়ে ওভারকোট চড়িয়ে অরুণকে বললাম, চল, একটু ঘুরে আসি।

প্রথমে অবশ্য সে আপত্তি করেছিল। কিন্তু আমি ওর কোন বারণই শুনলাম না। বেরিয়ে পড়লাম দুজনে। অরুণ একটা পাঁচ ব্যাটারির টর্চ সঙ্গে নিল, আমি নিলাম আমার টুলেয়ভ বোরের বন্দুকটা। পাহাড়ি জায়গা, বলা যায় না যদি কোন হিংস্র জন্তুর মুখোমুখি পড়ে যাই।

আকাশ পরিষ্কার, অসংখ্য তারা ঝলমল করছে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় আমি তীব্র শীত অনুভব করলাম। অরুণকে আমি বললাম, অসুস্থ ব্যক্তির বাড়ির চারপাশটা একবার ঘুরে দেখতে চাই। পথ বেশ কিছুটা চড়াই, তারপর আবার নিচের দিকে নেমে গেছে। উঁচু-নিচু পথ কিছুটা হাঁটতেই আমার শরীর গরম হয়ে উঠল, পরিশ্রম কম নয়। আকাশে নৈশবিহারী পাখিরা উড়ে বেড়াচ্ছে। পেঁচা, বাদুড় আরো কত কি নাম-না-জানা পাখি। মাঝে মাঝে বাদুড় ছাড়াও বেশবড় বড় পাখি

উড়ে যাচ্ছে। বিচিত্র কণ্ঠে সব ডেকে উঠছে। সমস্ত অঞ্চলটা সুষুপ্তির কোলে ঢলে পড়েছে, নিশাচর পাখিদের ডাকে রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে খানখান করে দিচ্ছে।

যে বাড়িটা আমাদের গন্তব্যস্থল ছিল, তার কাছাকাছি আসতেই একটা বাদুড় আমাদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। প্রকাণ্ড কালো বাদুড়। এত নিচু দিয়ে পাখিটা উড়ে গেল যে আমরা ওটাকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। পাখিটাও আমাদের লক্ষ্য করেছিল। কালো জ্বলজ্বলে চোখ। আমার গা কেমন যেন ছমছম করে উঠল।

আমরা বাড়িটার কাছে এসে দাঁড়ালাম। দরিদ্র পাহাড়ির কুঁড়ে, চালাটা বড় বড় পাতায় ছাওয়া। বেশির ভাগ কুঁড়েই ওই ধরনের। আমরা বাড়িটার চারপাশে একবার চক্কর দিয়ে আবার ফেরার পথ ধরলাম।

পরদিন সকালে আমি অরুণকে নিয়ে সমস্ত অঞ্চলটা ঘুরে দেখতে বেরোলাম। ঘুরতে ঘুরতে আমরা এক জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। একটা পাহাড়ি নদী সবেগে ছুটে চলেছে, সামনে খাড়া পাহাড়। নদীর তীরে পাহাড়ের কোল ঘেঁসে একটা পাথরের দুর্গের মত বাড়ি। ওই অঞ্চলে এমন একটা বাড়ি দেখব, এ আমি কল্পনাই করতে পারি নি। আমি অরুণকে জিজ্ঞেস করলাম, বাড়িটা কার ?

অরুণ বলল, ওটা প্রাচীন এক জমিদার বংশের আদি নিবাস। এক সময়ে তাদের শুধু এই অঞ্চলই নয়, আশপাশের অঞ্চলগুলোতেও দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল। অত্যাচারী বলেও তাদের যথেষ্ট দুর্নাম ছিল। শেষ পর্যন্ত প্রজারা ক্ষেপে গিয়ে বিদ্রোহ করে। একদিন গভীর রাত্রে তারা দলবদ্ধ হয়ে দুর্গবাড়ি আক্রমণ করে। তাদের রোষানলে জমিদার বংশের সকলেই নিহত হয়, শুধু একজন পালিয়ে বাঁচে। এতদিন বাড়িটা খালিই পড়েছিল, আগাছা আর জঙ্গলে ভেতরটা ভরে গেছল। কিছুদিন হল, যিনি পালিয়ে বেঁচেছিলেন তাঁর এক বংশধর আবার ফিরে

এসেছেন। জঞ্জাল পরিষ্কার করে বাড়িটা মেরামত করেছেন। ভদ্রলোক বেশ কিছুদিন বিলেতে ছিলেন। অমায়িক, জমিদারসুলভ দম্ভ নেই। অরুণের সঙ্গে নিজে এসে আলাপ করে গেছেন। মনে হয় বেশ ধনী,কারণ বহুদিনের অব্যবহৃত এই প্রকাণ্ড বাড়িটা সংস্কার করতে প্রচুর টাকা-পয়সাও নিশ্চয় খরচ হয়েছে। ভদ্রলোক অবিবাহিত,কাজ থেকে অবসর নিয়ে এসেছেন। বাকি জীবনটা পূর্বপুরুষদের ভিটেতেই কাটিয়ে দেবেন এই ইচ্ছে। সাম্প্রতিক রহস্যজনক ঘটনায় তিনিও নাকি বেশ আগ্রহ দেখাচ্ছেন। মাঝে মাঝে রাত্রে টহল দিয়ে বেড়ান যদি সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ে এই আশায়। আমার প্রশ্নের উত্তরে অরুণ জানাল ভদ্রলোকের নাম মিঃ লেবঙ। ভদ্রলোক শুধু একজন অনুচর নিয়ে বিরাট বাড়িটায় বাস করেন।

আমাদের কথার মধ্যেই দুর্গবাড়ির প্রকাণ্ড লোহার গেটটা খুলে গেল, আর মিঃ লেবঙকে সেই প্রথম দেখলাম আমি। আমাদের দেখে তিনি এগিয়ে এলেন। ভদ্রলোক বেশ লম্বা—প্রায় ছ'ফুট। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে হাঁটেন। অরুণ আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল। আমার পরিচয় শুনে তিনি চোখ কপালে তুলে কৃত্রিম ভয়ের সুরে বললেন, পাকা শিকারী তার ওপর রহস্যসন্ধানী, সাবধানে থাকাই ভাল। কি জানি আমার অতীত জীবনের কোন রহস্য যদি ভেদ করে দেন!

তাঁর কথার ভঙ্গিতে আমরা হেসে উঠলাম, তিনিও হাসিতে যোগ দিলেন। ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে, কিন্তু মুখে বার্ধক্যের ছাপ তো পড়েই নি, বরং তারুণ্যের আভাসই চোখে পড়ে। ভদ্রলোকের চোখ দুটো বেশ বড় বড়, গভীর দৃষ্টি যেন অন্তর্ভেদী। মুখে একটা আভিজাত্যের ছাপ লক্ষ্য না করে পারা যায় না, বেশ সুপুরুষ বলা চলে। তবে হাসবার সময় তাঁর সামনের দাঁত দুটো বেরিয়ে পড়ে। ছুঁচোল দাঁত, সমস্ত মুখের মধ্যে ও-দুটোই বেমানান।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা এগিয়ে চললাম। বর্তমান রহস্য সম্বন্ধেও আমাদের আলোচনা হল। মিঃ লেবণ্ড বললেন, যত দিন যাচ্ছে ক্রমশই তিনি হতাশ হয়ে পড়ছেন। অশিক্ষিত পাহাড়িদের বদ্ধমূল বিশ্বাসটাও তিনি এখন আর উড়িয়ে দিতে পারছেন না। এই প্রসঙ্গে স্কটল্যাণ্ডে একটা ভয়াবহ ঘটনার কথা তিনি বললেন। তিনি নিজে ওই সময় স্কটল্যাণ্ডে ছিলেন। একজন দুর্দান্ত খুনীকে ফাঁসির পর কবর দেওয়া হয়। তার কয়েক রাত পর থেকেই পর পর কয়েকটা ঘটনায় পুলিশ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।

প্রথম ঘটনায় এক গ্রাম্য চাষী রাত্রে যখন বাড়ি ফিরছিল, তখন ভয়ঙ্কর একটা জীব অতর্কিতে তাকে আক্রমণ করে মাটিতে ফেলে দেয়, তারপর তার গলায় দাঁত বসিয়ে রক্ত পান করতে থাকে। কয়েক রাত পরে ওই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে, এবার এক তরুণী ওই জীবের শিকার হয়। অবশ্য কোন ক্ষেত্রে আক্রান্তরা প্রাণ হারায় নি, কিন্তু তাদের প্রচুর রক্তক্ষয় হয়েছিল। পুলিশ চিন্তা করে দেখল, কবরখানার পাশ দিয়ে যে হাঁটা রাস্তা চলে গেছে, দু-দুবারই ওই পথের ওপরেই জীবটা আক্রমণ চালিয়েছে। তারা ফাঁদ পাতল। এক রাত্রে ওই পথের আশেপাশে সশস্ত্র পুলিশের লোক লুকিয়ে রইল, আর একজন সাধারণ পোশাকে ও পথ দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে যেতে লাগল। গত দু'বারই ঘটনা ঘটেছিল রাত দশটার পর, তাই ফাঁদও পাতা হল ওই সময়। অল্প চাঁদের আলোয় সব অস্পষ্ট দেখাচ্ছিল। হঠাৎ একটা আর্ত চিৎকারে পুলিশের দল সজাগ হয়ে উঠল। তারা তাদের সঙ্গীকে লক্ষ্য করে ছুটল। সে মাটিতে পড়েছিল, আর তার ওপর ঝুঁকেছিল একটা প্রাণী। কয়েক জোড়া পায়ের শব্দে যেন বাধা পেয়েই সেই প্রাণীটা তার শিকার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। একজন টর্চের আলো তার মুখে ফেলল। বীভৎস মুখ, অমানুষিক, মুখের দুই কষ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। সবে রক্ত চুষতে শুরু করেছিল, এমন সময় বাধা পেয়ে সে

হিংস্রভাবে তেড়ে এল, কিন্তু অতগুলি লোক দেখে শেষ পর্যন্ত পেছন ফিরে দৌড় মারল। একজন তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। গুলি তার পায়ে বিঁধল, কিন্তু কিছুই হল না। তার পেছনে পুলিশের দলও ছুটল। সেই অমানুষিক জীবটি কবরখানায় ঢুকে এক জায়গায় অদৃশ্য হয়ে গেল। তার অনুসরণকারীরাও সেখানে এসে দাঁড়াল। তারপর যে দৃশ্য তারা দেখল, তা ভয়ঙ্কর। সেই কুখ্যাত খুনীর কবরটা খোঁড়া—কফিন দেখা যাচ্ছে। কফিনে সে শুয়ে আছে, আর পূর্ণদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। সেই দৃষ্টিতে যেন অপরিসীম ঘৃণা ঝরে পড়ছে। দুই কষ বেয়ে ক্ষীণ রক্তের ধারা তখনও মুছে যায় নি।

পুলিশের দল আতঙ্কে শিউরে উঠল। তারা আর সেখানে দাঁড়াল না, পালিয়ে বাঁচল। সারা রাত ধরে পরামর্শ চলল—বিশেষজ্ঞরা এলেন। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হল, দিনের বেলা কফিন থেকে দেহটাকে বের করে পুড়িয়ে ফেলা হবে। বিশেষজ্ঞরা এটা বুঝেছিলেন যে, রাত্রে ওই জীবটা পিশাচ হয়ে উঠলেও দিনে ওর কোন ক্ষমতা থাকে না।

পরদিন দেহটাকে কফিন থেকে বয়ে নিয়ে এসে ইলেকট্রিক চুল্লীতে শোয়ানো হল। সুইচ টেপা মাত্র চুল্লীটা জ্বলে উঠে দেহকে স্পর্শ করল, আর সঙ্গে সঙ্গে জ্বলন্ত আগুনের চিতা থেকে এক অমানুষিক আর্তনাদে সমবেত সকলের শরীর যেন হিম হয়ে গেল।

যাই হোক, শরীরটা পুড়ে ছাই হয়ে যাবার পর থেকে আর কোন উৎপাত হয় নি।

মিঃ লেবঙ তাঁর কাহিনী শেষ করে আমাদের মুখের দিকে তাকালেন। বোধ হয় আমাদের প্রতিক্রিয়া বুঝতে চাইলেন।

আমি আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম, অরুণের মুখ শাদা হয়ে গেছে। আমি মিঃ লেবঙের মুখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বললাম, হ্যাঁ, এরকম অনেক ভূতের গল্প ইংরেজি বইয়ে পড়েছি।

আমার উত্তর শুনে ভদ্রলোক যেন একটু ক্ষুণ্ণ হলেন বলে মনে হল। তিনি আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে গেলেন।

আমরা এবার হাঁটা দিলাম সেই পীড়িত ব্যক্তির কুঁড়ের দিকে। দিনের বেলা তাকে ভাল করে পরীক্ষা করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য।

আমরা সেই কুঁড়ে ঘরে প্রবেশ করলাম। কুঁড়ের অন্য লোকজনের মুখ থমথম করছে। ঘরের মধ্যে একটা চারপায়ায় রোগী শুয়ে আছে। বয়স ত্রিশের বেশি নয়। রক্তশূন্যতায় সমস্ত শরীর ফ্যাকাশে হয়ে গেছে—পাণ্ডুর মুখ। আমি তার পাশে দাঁড়ালাম। গলায় দুটো ক্ষতের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে, যেন তীক্ষ্ণ অথচ সূক্ষ্ম কোন অস্ত্র গলায় বিঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি ঝুঁকে পড়ে সেই ক্ষত দুটো পরীক্ষা করতে লাগলাম। ক্ষতের মুখে রক্তবিন্দু জমে কালো হয়ে আছে। হঠাৎ রোগী চোখ মেলে তাকাল। ঘোলাটে চোখ, বিভ্রান্ত দৃষ্টি। লোকটি বার কয়েক ঘাড় বেঁকিয়ে তার ডান দিকে বেড়ার গায়ে বড় চৌকো যে ফোকর, সেটা দেখল।

আমি তার দৃষ্টি অনুসরণ করে ওটা দেখলাম। ফোকরটার মাথার ওপর একটা ঝাঁপ ঠেকা দেওয়া রয়েছে। বুঝলাম, ওই ফোকরটাই হল ঘরের জানলা। কিন্তু লোকটি ওদিকে তাকাচ্ছে কেন? তবে কি কোন হিংস্র প্রাণী ওর ভেতর দিয়ে ঘরে ঢুকে তাকে আক্রমণ করেছিল? আমি যুক্তি দিয়ে বিচার করে দেখলাম, তা সম্ভব নয়। কারণ সেক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তি নিশ্চয় চিৎকার কিংবা আত্মরক্ষার চেষ্টা করত। ঘরের অন্য লোকজন তখন নিশ্চয় উঠে পড়ে সেই জন্তুটিকে তাড়া করত। তাছাড়া ফোকরটা অনেকটা উঁচুতে, নিচে থেকে লাফিয়ে ওই ফোকর দিয়ে ঘরে ঢোকাও সহজ কথা নয়। আমি সেই ফোকরটার তলায় গিয়ে দাঁড়ালাম। আমি পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি লম্বা—হাত সোজা তুলে দিলে তবে ঝাঁপের নাগাল পাই। বাইরে বেরিয়ে ঠিক ফোকরের তলা এবং তার চারপাশ আমি উবু হয়ে পরীক্ষা

করে দেখলাম। না, মাটির ওপর কোন মানুষ বা জন্তুর পায়ের ছাপ চোখে পড়ল না।

আমি অরুণকে নিয়ে চললাম। পীড়িত লোকটির যা অবস্থা দেখলাম, বাঁচবে বলে মনে হয় না। আমার মন বিষাদে ভরে গেল। নিঃশব্দে আমরা দুজন হাঁটছিলাম। হঠাৎ একটা চিন্তা আমার মাথায় ঝিলিক দিয়ে গেল। আমি থমকে দাঁড়ালাম। ওই ফোকর দিয়ে জন্তু ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর ঢোকা অসম্ভব নয়।

অরুণ আমার পাশাপাশি হাঁটছিল। আমাকে ওভাবে দাঁড়াতে দেখে সে একটু অবাক হয়েই বলল, কি হল?

আমি আর ওকে কিছু বললাম না। যে সন্দেহ আমার মনে দানা বাঁধতে শুরু করেছে, তা নিজেই চেপে রাখলাম।

আমি অরুণের কোয়ার্টারেই উঠেছিলাম, ও ব্যাচিলার হওয়ায় কোন অসুবিধে ছিল না। এক পাহাড়ি ছোকরা কম্বাইণ্ড-হ্যাণ্ড হিসেবে ভালই কাজ করছিল। আমি দুপুরে বেশ কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিলাম, সারা রাত জাগব এই ছিল আমার প্ল্যান। বিকেলে চায়ের টেবিলে অরুণ জানাল, মিঃ লেবঙ নৈশভোজ তাঁর ওখানে সারবার জন্য খবর পাঠিয়েছেন—দুজনকেই যেতে বলেছেন। আমি মিঃ লেবঙের হঠাৎ এই অনুগ্রহের কারণ জিজ্ঞেস করলাম।

অরুণ হেসে বলল, জরুরী জহর চেনে। তোমাকে দেখে উনি খাঁটি জহর বুঝতে পেরেছেন। তাই পরিচয় আরও নিবিড় করতে ইচ্ছুক বলে মনে হয়, আমি উপসর্গ মাত্র।

সন্ধ্যাবেলা অরুণ হঠাৎ একটা জরুরি কাজে আটকা পড়ে গেল। আমাকে একাই মিঃ লেবঙের ওখানে যাবার জন্য অনুরোধ করল। কেউ না গেলে অভদ্রতা হবে। অগত্যা সাতটার পর আমি একাই বেরিয়ে পড়লাম। বন্দুকটা আর নিলাম না, ওটা হাতে নিয়ে নেমন্তন্ন খেতে যাওয়াটা আমার বিসদৃশ মনে হল। তবে একটা সুদৃশ্য অথচ

মজবুত বেড়াবার লাঠি হাতে নিলাম। অরুণ কিন্তু সহজে ছাড়ল না, তার রিভলবারটা আমার লং কোটের পকেটে ঢুকিয়ে দিল। এসব জায়গায় বিশ্বাস নেই। আজকে চাঁদের আলো গত রাত্রের চাইতে উজ্জ্বল।

মিঃ লেবঙের দুর্গবাড়ির কাছাকাছি আসতেই আমার মনে হল, যেন লোহার গেটের ওপারে একটা দীর্ঘ কালো ছায়া নড়াচড়া করছে। আরো দু-পা এগোতেই ছায়াটা মানুষের আকার নিল—মিঃ লেবঙ।

কালো প্যান্ট আর কালো গাউনের মত একটা পোশাক পরেছন, তাই কালো ছায়া মনে হচ্ছিল। ভদ্রলোক আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। আমাকে একা দেখে অরুণের কথা জিজ্ঞেস করলেন। আমি তার হঠাৎ কাজ পড়ে যাওয়ার কথা বলে তার হয়ে ক্ষমা চাইলাম।

ভদ্রলোক আমাকে তাঁর বসবার ঘরে নিয়ে গেলেন। বিরাট হল। নবাব-বাদশার আমলের কথা মনে করিয়ে দেয়। পাথরের দেয়াল, মসৃণ মেঝে, কিন্তু কালের ছোঁয়াচ লেগে চারদিকে ফাটল ধরেছে, এখানে ওখানে ভেঙেও পড়েছে। হলের মাঝখানে একটা ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছিল। সমস্ত ঘরটার পক্ষে ওই আলো পর্যাপ্ত নয়। আলোর পরেই আবছা অন্ধকার—একটা কেমন যেন ভূতুড়ে পরিবেশ।

আমি কৌতূহল নিয়ে চারদিক দেখছি, সেটা লক্ষ্য করে মিঃ লেবঙ হাসি মুখে জিজ্ঞেস করলেন, প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পে আমার আগ্রহ আছে কিনা। আমি সম্মতি জানাতে তিনি বললেন যে, দুর্গবাড়িটা প্রায় চারশ' বছর আগে তাদের এক পূর্বপুরুষ তৈরী করেছিলেন। তিনি আমাকে সমস্ত বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখাতে লাগলেন।

নীচটা দেখার পর ঘোরানো লোহার সিঁড়ি বেয়ে আমরা ওপরে উঠতে লাগলাম। বাড়িটা গম্বুজাকৃতি। ওপরে গম্বুজ-ঘরে পৌঁছে আমার হাঁপ ধরে গেল। মাটি থেকে কম করে ষাট ফুট ওপরে উঠেছি।

সেখান থেকে নিচের পৃথিবীর দৃশ্য যেন মায়াময় মনে হতে লাগল। মিনিট দশেক সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম। নীচে নামবার জন্যে সবে পা বাড়িয়েছি, এমন সময় একটা বাদুড় কোথা থেকে উড়ে এসে মিঃ লেবঙের কাঁধের ওপর বসল। তারপর তাঁর মুখে মৃদু ঠোক্কর দিয়ে যেন আদর করতে লাগল।

আমার বিস্মিত ভাব লক্ষ্য করে মিঃ লেবঙ পাখিটার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, এটা কেন জানি না আমাকে ভালবেসে ফেলেছে। আমি এখানে এলেই আমার কাছে চলে আসে।

নীচে নামার পর আমরা খেতে বসলাম। ওই হলের মধ্যেই খাবার আয়োজন হয়েছিল। একটা গোল টেবিলের দুই বিপরীত দিকে দুটো চেয়ার মুখোমুখি সাজানো হয়েছে। একটা বড় ট্রের ওপর কাচের পাত্রে সাজানো মুখরোচক সব আহার্য নিয়ে একটি লোক আমার পাশে এসে দাঁড়াল। লোকটিকে দেখে আমি প্রায় চমকে উঠেছিলাম। চীনাম্যান—লম্বায় সাড়ে চার ফুটের বেশি হবে না। লোকটির গায়ের রং পীত, দাঁতগুলিও হলদে, আর কুত্‌কুতে চোখ দুটিতে যেন ভাষাহীন দৃষ্টি।

মিঃ লেবঙ বোধ হয় আমার মনের অবস্থা বুঝেছিলেন। একটু হেসে আমাকে আশ্বস্ত করার জন্য তিনি বললেন, ওর নাম ওয়াং, হার্মলেস চ্যাপ।

কাচের পাত্রগুলি আমার কাছে সাজিয়ে দিয়ে ওয়াং চলে গেল।

আমি একটু অবাক হয়েই মিঃ লেবঙের মুখের দিকে তাকালাম। তিনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, ও, আপনাকে বলা হয় নি। বিলেতে থাকাকালে আমার একটা অদ্ভুত রোগ হয়। ডাক্তাররা তার ডায়গনোসিস দূরের কথা, নাম পর্যন্ত ঠিক করতে পারেন নি। এই রোগের ফলে কোন সেদ্ধ খাবার আমি খেতে পারি না, সব কাঁচা খেতে হয়।

কাঁচা! আমি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম।

হ্যাঁ, কাঁচা। যেমন কাঁচা দুধ, কাঁচা সব্জি, ফল-মূল এই আর কি। মৃদু হেসে তিনি বললেন, কাঁচা মাংসও চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ধাতে সইল না।

রান্না করা কোন জিনিসই আপনার হজম হয় না?

না। মিঃ লেবঙ যেন একটু দুঃখের হাসি হাসলেন, আপনারা সব সুস্বাদু, মুখরোচক খাবারে রসনা পরিতৃপ্ত করেন, কিন্তু আমি সেই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত।

মিঃ লেবঙের জন্য আমি অনুকম্পা বোধ না করে পারলাম না।

তিনি আমার মনের ভাব ঠিক ধরে ফেললেন। বললেন, আমার জন্য কেউ দুঃখ প্রকাশ করুক, তা আমি পছন্দ করি না। আমিও ভগবানের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছি। দেখে নেব, কত বড় শক্তিমান তিনি।

মিঃ লেবঙের দু' চোখ জ্বলে উঠল। মুখে একটা কঠিন ভাব দেখা দিল। আমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, মনের আবেগ প্রকাশ করে ফেলার জন্য আমি দুঃখিত। আমার দিকটাও আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন। নিন, শুরু করুন। খাবার জুড়িয়ে যাচ্ছে।

আমি বললাম, আপনি যা খান, তাই দিয়ে যাক। একসঙ্গেই খাওয়া যাবে।

তিনি বললেন যে, একটা বিশেষ ধরনের খাবার ওয়াং তাঁর জন্য বানাচ্ছে, একটু সময় লাগবে। অগত্যা আমাকে একা-একাই শুরু করতে হল। ওয়াংয়ের চেহারা কদর্য হলে কি হবে, রাঁধার হাত চমৎকার। মিহি সুগন্ধ চালের ঝুরঝুরে পোলাও, মাংসের শিক-কাবাব, গোটা গোটা টাইপের রোস্ট আর পেস্তা-বাদাম দিয়ে পুডিং জাতীয় একটা সুস্বাদু খাবার। সব ক'টা রান্নাই মুখে লেগে থাকার মত।

খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। আমি কয়েকবারই লক্ষ্য করলাম, মিঃ লেবঙ ঘাড় ফিরিয়ে ওয়াংয়ের যাতায়াতের পথের দিকে তাকালেন। শেষের দিকে তিনি যে বেশ অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছেন তা বুঝতে পারলাম। আমি মনে মনে ভাবলাম, এমন কি বিশেষ খাবার ওয়াং বানাচ্ছে যে এত সময় লাগছে!

শেষ পর্যন্ত ওয়াং এল, তার হাতে ছোট গামলার মত একটা কাচের বাটী। সেই বাটীর দিকে তাকিয়ে আমি প্রায় লাফিয়ে উঠলাম। কাচের স্বচ্ছ বাটীতে লাল তরল রক্ত টলটল করছে, যেন সদ্য কোন প্রাণী হত্যা করে রক্ত নিয়ে আসা হয়েছে। মিঃ লেবঙের যেন আর তর সইছিল না, ওয়াংয়ের হাত থেকে বাটীটা প্রায় কেড়ে নিয়ে তিনি এক চুমুকে সেটা নিঃশেষে পান করলেন। তাঁর মুখ দিয়ে তৃপ্তিসূচক একটা ধ্বনি বেরোলো, আঃ! বাটীটা তিনি ওয়াংয়ের হাতে ফিরিয়ে দিলেন।

তাঁর রক্তরাঙা ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে আমি শিউরে উঠলাম।

মিঃ লেবঙ একটা তোয়ালে আলগা ভাবে ঠোঁটের ওপর চাপতে চাপতে বললেন, টমেটোর রস, ওই আমার একমাত্র খাবার।

টমেটোর রস যে অত লাল হতে পারে, তা আমার ধারণা ছিল না। পাহাড়ি অঞ্চলে সব কিছুই বিচিত্র।

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর আমি বিদায় নিলাম। মিঃ লেবঙ আমাকে গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন।

আমি কিছুটা গিয়ে আবার ফিরে এলাম। মিঃ লেবঙ ভেতর থেকে গেট বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আমি গেট টপকে পার হলাম। নিঃশব্দে হাঁটছি। সামনের দিকে না গিয়ে পাশ ধরে আমি এগোলাম। একটা বাদুড় আমার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল, একটা পেঁচা ডেকে উঠল।

হলঘরের একটা জানলার তলায় এসে আমি দাঁড়ালাম। জানলাটা

বেশ উঁচু, মাটি থেকে দাঁড়িয়ে ভেতরের কিছু দেখা যায় না। এদিক ওদিক তাকাতে একটা কাঠের প্যাকিং বাক্স আমার চোখে পড়ল। আমি আর দ্বিরুক্তি না করে সেটা এনে জানলার তলায় রাখলাম। ওটার ওপর উঠে দাঁড়িয়ে আমি ভেতরের সব কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম। মিঃ লেবঙ একটা আরাম কেদারায় অর্ধ-শয়ান ভাবে চোখ বুজে আছেন। টেবিলের ওপর উচ্ছিষ্ট বাসনপত্র তখনো পড়ে আছে। আমি মিঃ লেবঙের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভাবলেশহীন মুখ। দেয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বাজতেই মিঃ লেবঙ উঠে দাঁড়ালেন।

আমি মাথাটা যতদূর সম্ভব সরিয়ে নিলাম, যাতে তিনি আমাকে দেখতে না পান। সর্বনাশ, উনি যে জানলার দিকেই আসছেন। আমি তাড়াতাড়ি নেমে সরে দাঁড়ালাম।

মিঃ লেবঙ গরাদবিহীন জানলা দিয়ে মাথাটা বের করে আকাশের দিকে তাকালেন। কি দেখছেন, কে জানে! মিনিট কয়েক তিনি এইভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর তাঁর মাথাটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি আবার সন্তর্পণে প্যাকিং বাক্সর ওপর উঠে দাঁড়ালাম। দু-হাত পেছনে রেখে ভদ্রলোক অস্থির ভাবে পায়চারি করছেন। কপালে কুটিল রেখা ফুটে উঠেছে। মিনিট দশেক বোধ হয় তিনি এইভাবে প্রকাণ্ড হলটার এ-মাথা থেকে ও-মাথা হাঁটলেন। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

তিনি বেরিয়ে যাবার সামান্য পরেই ওয়াং ঘরে ঢুকল। বাসনপত্র তুলে নিয়ে সে চলে গেল। পরমুহূর্তেই সে ফিরে এল। এবার তার হাতে একটা বড় মোমবাতি। ঝাড়লণ্ঠনের কাচের আধারে কেরোসিন তেলের আলো জ্বলছিল। টেবিলের ওপর একটা চেয়ার নিয়ে সে তার ওপর উঠে দাঁড়াল, তারপর ফুঁ দিয়ে আলো নিভিয়ে দিল।

সমস্ত হলটা অন্ধকার হয়ে গেল, শুধু মোমবাতির ক্ষীণ আলোয় যা দেখা যায়।

ওয়াং চলে যাবার পর আরো আধঘণ্টা আমি অপেক্ষা করলাম। তারপর দু-হাতে ভর দিয়ে শরীরটাকে তুলে জানলায় উঠে পড়লাম। সেখান থেকে এক লাফে হলের ভেতর। সূচীভেদ্য অন্ধকার। আমি পকেট থেকে পেন্সিল-টর্চটা বের করে এগিয়ে চললাম। পা টিপে টিপে অত্যন্ত সতর্কভাবে আমি হাঁটছি। ধরা পড়ে গেলে কৈফিয়ৎ দেবার কিছু নেই। মিঃ লেবঙ আমাকে সব ঘর ঘুরিয়ে দেখিয়ে ছিলেন, তাই আমার বিশেষ কোন অসুবিধে হচ্ছিল না।

একটার পর একটা ঘরে আমি ঢুকলাম। সব অন্ধকার। টর্চের আলোয় সন্দেহজনক কিছু আমার চোখে পড়ল না। মিঃ লেবঙকে দেখতে পেলাম না, তবে কি ভদ্রলোক এত রাত্রে আবার বেরিয়েছেন! অরুণের কথা আমার মনে পড়ে গেল। ভদ্রলোক মাঝে মাঝে রাত্রে টহল দিয়ে বেড়ান, যদি সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ে। কথাটা মনে পড়তেই আমার মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল। বাম দিকের শেষ প্রান্তের একটা ঘর থেকে ক্ষীণ আলোর রেখা ভেসে আসছিল। আমি ঢালা বারান্দা দিয়ে সেই দিকে এগোলাম। কিছুটা যাবার পরই সেই ঘরের দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল। আমি তাড়াতাড়ি একটা থামের আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম।

একটা ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছে। মূর্তির হাঁটা-চলা কেমন যেন সন্দেহজনক। একটু কাছে আসতেই আমি বুঝলাম, ও আর কেউ নয়, ওয়াং। সে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, কেমন যেন একটা সন্ত্রস্ত ভাব। হাতে একটা খনিত্র। বারান্দা ছেড়ে ওয়াং মাটিতে নেমে পড়ল, তারপর বরাবর পূর্বমুখে হাঁটতে লাগল।

আমি একটু পেছন থেকে তাকে অনুসরণ করলাম। একটা বড় গাছের তলায় সে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি ঝোপঝাড়ের আড়াল দিয়ে

যতটা সম্ভব ওর কাছে এগিয়ে গেলাম। নিরাপদ ব্যবধান রেখে আমি একটা গাছের আড়াল থেকে ওর সন্দেহজনক আচরণের কারণ আবিষ্কারের চেষ্টা করতে লাগলাম। ওয়াং ততক্ষণে তার হাতের যন্ত্রটা দিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করেছে। অনেকখানি জায়গা নিয়ে বেশ বড় একটা গর্ত নিপুণ হাতে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সে খুঁড়ে ফেলল। আমার বিস্ময়ের অন্ত নেই, অত বড় গর্ত করছে কেন? কাকে গোর দেবে? আমার সবকিছু সন্দেহের নিরসন ঘটতে বেশি সময় লাগল না। মাটি খোঁড়া শেষ করে ওয়াং উঠে দাঁড়াল, তারপর অন্ধকারে পড়ে-থাকা কি একটা টানতে টানতে গর্তের কাছে নিয়ে এল। চাঁদের আলোয় আমি সবিস্ময়ে দেখলাম, ওটা একটা মুণ্ডহীন ছাগল। ছাগলটাকে গর্তের মধ্যে ফেলে ওয়াং এবার মাথাটা নিয়ে এল, তারপর মাটি চাপা দিতে লাগল। কাজ শেষ করে সে উঠে দাঁড়াল, একবার আকাশের দিকে তাকাল, তারপর দ্রুতপায়ে ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

দুর্গবাড়ির চারদিকে উঁচু পাঁচিল। আমি আবার গেট টপকে অরুণের কোয়ার্টারের পথ ধরলাম। অনেকগুলি চিন্তা আমার মাথায় কিলবিল করছে, সব রহস্যের একটা সূত্র যেন আমি খুঁজে পেয়েছি। গভীর ভাবে চিন্তা করতে করতে আমি মাথা নীচু করে হাঁটছিলাম। হঠাৎ ইন্দ্রিয়ের ষষ্ঠ অনুভূতিতে আমি মাথা তুললাম, আর সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে উঠলাম। একটা প্রকাণ্ড বাদুড় হিংস্রভাবে আমাকে লক্ষ্য করেই যেন তেড়ে আসছে। ওর বড় বড় কালো চোখে পৈশাচিক উল্লাস—মুখটা একটু হাঁ করা, দুটো শাণিত দাঁত ঝকঝক করছে। বাদুড়টা প্রায় আমার ওপর এসে পড়েছে। কোটের পকেট থেকে রিভলবার বের করার সময় ছিল না। আমি হাতের লাঠিটা দু-হাতে চেপে ধরে সজোরে ওটাকে লক্ষ্য করে মারলাম। ওটা সাঁৎ করে সরে গেল, কিন্তু লাঠিটা সম্পূর্ণ এড়াতে পারল না। একটা ডানায় আঘাত লাগল।

ঝটাপট করতে করতে বাহুড়টা আমাকে ছেড়ে দিয়ে উড়ে গেল। ওটা কোথায় যায় দেখবার আশায় আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলাম। উড়তে উড়তে ওটা দুর্গবাড়ির গম্বুজের ওপর বসল। ঠিক এই সময় এক ফালি মেঘ চাঁদকে ঢেকে ফেলল, সব অন্ধকার হয়ে গেল। মেঘ সরে যাবার পর আর আমি ওটাকে দেখতে পেলাম না।

পরদিন সকালে অরুণকে আমি আমার নৈশ অভিজ্ঞতার কাহিনী বলে যে সন্দেহ আমার মনে দানা বেঁধেছিল, তা খুলে বললাম।

আমার বক্তব্য শেষ হলে ও অবিশ্বাসের সুরে বলল, তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে? এই বিংশ শতাব্দীতে কেউ রক্তচোষা বাহুড়ের কথা বিশ্বাস করে?

আমি বললাম, কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে শুনেছি রক্তচোষা বাহুড় আছে। ঘুমন্ত মানুষের রক্ত এমনভাবে তারা চুষে খায় যে, লোকটি টেরও পায় না।

অরুণ কিছুতেই আমার যুক্তি মানতে রাজি নয় দেখে আমি বললাম, পীড়িত লোকটির ঘরে ঢুকে একটা জিনিস তুই লক্ষ্য করেছিলি কিনা জানি না, বার বার সে বেড়ার গায়ে ফোকর বা জানলার দিকে তাকাচ্ছিল। নিশ্চয় তার একটা কারণ আছে। ওই ফোকর দিয়েই কি কোন জন্তু ঘরে ঢুকে লোকটিকে দংশন করেছিল? যুক্তি দিয়ে আমি ভেবে দেখলাম যে, তা সম্ভব নয়। কারণ ফোকরটা অনেক উঁচুতে, কোন জন্তুর পক্ষে মাটি থেকে অতটা লাফিয়ে ঘরে ঢোকা হুঃসাধ্য ব্যাপার। বিশেষ করে ফোকরটা যখন নেকড়ে জাতীয় হিংস্র প্রাণীর প্রবেশের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। দ্বিতীয়ত, যদি কোন প্রাণী ঢুকেই থাকে, তবে কি আক্রান্ত ব্যক্তি চিৎকার করবে না? আর তার আর্তনাদে ঘরের অন্যান্যদের ঘুম ভেঙে যাবে না? তবে আর কি হতে পারে? তোর মনেথাকতে পারে, ফেরার পথে আমি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। কারণটা আর কিছু নয়, আমার মাথায় চকিতে একটা সম্ভাবনা উঁকি

দিয়েছিল—জন্তু না ঢুকতে পারে, কিন্তু পাখি তো ঢুকতে পারে। সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে পড়ে গেল আগের রাত্রে দেখা সেই বাদুড়টির কথা। অত বড় বাদুড় সচরাচর চোখে পড়ে না—চোখ দুটো যেন জ্বলছিল। আফ্রিকার জঙ্গলে যদি রক্তচোষা বাদুড় থাকতে পারে, তবে এখানে কেন নয় ? চারধারে পাহাড়, বড় বড় অসংখ্য গাছ, ঘন জঙ্গল, সব কিছু পরিবেশই তো আছে। কাল রাত্রে বাদুড়টা আমাকে আক্রমণ করবার চেষ্টা করায়, আমার মনে এখন আর সন্দেহ নেই যে, রক্তচোষা বাদুড়ই সব রহস্যের মূল। এটা হয়তো তোকে মনে করিয়ে দিতে হবে না যে, বাদুড় নিরীহ প্রাণী, অকারণে মানুষকে আক্রমণ করার মত ধৃষ্টতা তাদের হবে না। সুতরাং ওটা সাধারণ বাদুড় নয়। কাল রাত্রে যেটা আমাকে আক্রমণ করেছিল, সেটা আর প্রথম দেখা বাদুড়টা যে এক, সে বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই।

অরুণ এবার আর আমার যুক্তি ঠেলতে পারল না। বলল, তবে উপায় ?

আমি বললাম, ওটাকে মারতে হবে। রাত্রে ছাড়া তো ওর দেখা পাওয়া যাবে না।

আমাদের কথার মধ্যে একজন এসে খবর দিল যে, সেই হতভাগ্য রোগীটা মারা গেছে। আমি মনে মনে ভাবলাম, এবার কার পালা কে জানে। অরুণকে আমি বললাম, সমস্ত অঞ্চলে ঢেঁড়া পিটিয়ে দাও, যেন রাত্রে ঘরের ঝাঁপ খুলে না ঘুমোয়।

অরুণের সঙ্গে কথাবার্তার পর আমি দুর্গবাড়ির দিকে হাঁটা দিলাম। ওয়াংয়ের কাল রাত্রের অস্বাভাবিক আচরণের কারণটা জানার কৌতূহলও আমার কম ছিল না। গেটের কাছাকাছি পৌঁছতেই মিঃ লেবঙ বেরিয়ে এলেন। ভদ্রলোকের ডান হাতে ব্যাণ্ডেজ, হাতটা ঝোলানো রয়েছে। আমি সবিস্ময়ে কি হয়েছে জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন, গত রাত্রে আপনি বিদায় নেবার ঘন্টাখানেক পর আমি

বেরিয়েছিলাম। বেশ খানিকটা যাবার পর হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড কালো বাদুড় আমাকে আক্রমণ করে। আত্মরক্ষার জন্য ডান হাত দিয়ে আমি বাধা দিতে থাকি, তারপর এক সময় পা হড়কে পড়ে যাই। হাতে বেশ চোট লেগেছে।

আর বাদুড়টা? আমি প্রশ্ন করি।

আমি পড়ে যাওয়ার পর কেন জানি না, ওটা আমাকে ছেড়ে উড়ে চলে যায়।

মিঃ লেবণ্ডের আহ্বানে আমি তাঁর হলঘরে আবার গিয়ে বসলাম। দু-চারটে কথার পর আমি তাঁকে আমার সন্দেহের কথা বললাম। সব শুনে তাঁর মুখ থেকে যেন রক্ত উবে গেল। লক্ষ্য করে দেখলাম, বাঁ হাতটা কাঁপছে। আমি উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, আপনি অসুস্থ বোধ করছেন?

তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, আপনি যে সাংঘাতিক কথা বলছেন মিস্টার গুপ্ত, রক্তচোষা বাদুড়! ভ্যামপায়ার! কয়েক মুহূর্ত থেমে তিনি বলে উঠলেন, ব্র্যাম স্টোকারের 'ড্রাকুলা' বইটা পড়েছেন?

আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিলাম।

আপনার কথা শুনে ড্রাকুলার কাহিনী আমার মনে পড়ে গেল, তাই আমি নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম। হরিব্‌ল্ স্টোরি।

আমারও মনে পড়ল। কাউণ্ট ড্রাকুলা, মানুষ নয়তো প্রেত—দিনের বেলা সে তার কফিনে ঘুমোত, আর রাত্রে জেগে উঠে বাদুড়ের রূপ নিয়ে আকাশ-পথে শিকারের সন্ধানে বেরোত। অনায়াসে উন্মুক্ত গবাক্ষ দিয়ে যে কোন শয়নকক্ষে সে প্রবেশ করত। তারপর স্ব-মূর্তি ধারণ করে নিশ্চিন্তে নিদ্রিত ব্যক্তির গলা থেকে রক্ত চুষে পান করত। যত বেশি রক্ত সে পান করত, তারই তারুণ্যের জোয়ারে সে দীর্ঘায়ু হয়ে উঠত। ধূর্ত, চতুর, শয়তানের প্রতিমূর্তি ছিল কাউণ্ট ড্রাকুলা।

যাদের গলায় একবার সে দাঁত বসাতো, তারাও ভ্যামপায়ার হয়ে যেত। এইভাবে প্রেত-সাম্রাজ্য গড়ে তুলছিল।

এখানকার ঘটনার সঙ্গে ওই কাহিনীর কোন সামঞ্জস্য আছে কি? নিছক রক্তচোষা বাদুড় না হয়ে এখানেও বাদুড়রূপী কোন প্রেতের যদি আবির্ভাব হয়ে থাকে? পরক্ষণেই আমি আমার উদ্ভট কল্পনার কথা ভেবে মনে মনে হেসে উঠলাম। এটা শুধু বিংশ শতাব্দীই নয়, মানুষ এখন চাঁদের মাটিতে হেঁটে বেড়াচ্ছে! হঠাৎ আমার চোখ পড়ল মিঃ লেবঙের ওপর। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি আমাকে লক্ষ্য করছেন, যেন মনের ভাব বোঝবার চেষ্টা করছেন।

আমার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই তিনি বললেন, আপনিও সম্ভাবনার কথাটা ভেবেছেন দেখছি। তবে কাউন্ট ড্রাকুলা রাত্রে জেগে উঠত, দিনে তার দেখা পাওয়া যেত না। আমাদের তেমন কোন লোকের সন্ধান করতে হবে।

আমি ঘটনাকে লঘু করার উদ্দেশ্যে মৃদু হেসে বললাম, ওটা তো নিছক গল্প।

ওয়াংকে দেখতে না পেয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সে কোথায়? মিঃ লেবঙ বললেন, সারারাত সে জেগে পাহারা দেয়, তাই দিনের বেলা ঘুমোয়।

অরুণের ঘোষণায় কাজ হয়েছিল। সবাই রাত্রে ঘরের দরজা জানলা এঁটে দিত, তাই দিনকয়েক নিরুপদ্রবে কাটল। তারপরই আবার একজন ওই মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হল। এবার একজন সতেরো-আঠারো বছরের যুবতী। মেয়েটি নাকি রাত্রে কোন বিশেষ কাজে বাইরে বেরিয়েছিল, ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে তার মা বেরিয়ে দেখে সে মাটিতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

আমি বুঝতে পারলাম, বাদুড়টা এবার মরিয়া হয়ে উঠেছে।

ঘরে ঢুকতে না পেরে বাইরের লোকজনকে আক্রমণ করতে শুরু করেছে।

অরুণকে নিয়ে তক্ষুণি সেই বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। এক রাত্রেই মেয়েটি সাদা হয়ে গেছে, ক্ষুধার্ত ভ্যামপায়ার তার আকণ্ঠ রক্তপান করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। গলার ক্ষত বেশ গভীর। আমার মাথায় একটা মতলব এল। এই সুযোগ হাতছাড়া করব না। মেয়েটির বাবাকে বললাম, রাত্রে যেন ঘরের ঝাঁপ-জানলাটা খুলে রাখে, আমরা পাহারায় থাকব। একটা জিনিস যা লক্ষ্যণীয় তা হল প্রতিটি ক্ষেত্রেই আক্রান্ত পুরুষ কিংবা নারী তরুণ-তরুণী। বয়স্ক কেউ এই রোগের কবলে পড়ে নি। এ থেকে বেশ বোঝা যায়, তরুণের রক্তের ওপরই বাদুড়ের লোভ বেশি।

রাত্রে তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে আমি আর অরুণ বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে বন্দুকটা নিতে আমি ভুললাম না, অরুণ তার রিভলবারটা নিল। প্রথম রাত্রে কিন্তু কিছু ঘটল না। হয়তো শিকারের অপ্রতুলতা ঘটায় ভ্যামপায়ার একবার কয়েক দিনের মত রক্তপান করেছে, তাই শিকারে বেরোবার তাগিদ ঘটে নি। দ্বিতীয় রাতটাও নির্বিঘ্নে কাটল, মেয়েটির অবস্থা একটু ভালর দিকে। তৃতীয় রাত্রের ভয়ঙ্কর ঘটনা কোনদিনই আমি ভুলব না। অরুণকে তো কিছুদিন মানসিক রোগের চিকিৎসা করতে হয়েছিল।

যথারীতি আমরা জানলার অদূরে একটা ঝোপের আড়ালে বসে আছি। পরপর দু-রাতে কিছু না ঘটায় অরুণ আমার সিদ্ধান্তে সন্দিহান হয়ে পড়েছিল।

মেঘলা আকাশ, দু-চার ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ছে, ঠাণ্ডা হাওয়ায় আমরা যেন জমে যাচ্ছি। আমার রেডিয়াম ঘড়িতে তাকিয়ে দেখলাম রাত বারোটা। হঠাৎ একটা শব্দে আমরা উৎকর্ণ হয়ে উঠলাম, বড় কোন পাখির ডানার ঝটাপট শব্দ। আকাশে চাঁদ না থাকায় চারদিকে

জমাট অন্ধকার। আমরা সেই শব্দ লক্ষ্য করে গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে দৃষ্টি মেলে দিলাম।

একটা কালো ছায়া যেন জানলাটার কিছু ওপরে চক্কর দিচ্ছে। ততক্ষণে অন্ধকারে দৃষ্টি কিছুটা সহজ হয়ে এসেছে। হ্যাঁ, একটা বাদুড়ই বটে। বার কয়েক ঘুরে ওটা ঈগলের মত ভঙ্গিতে নেমে এল, তারপর ফোকর দিয়ে নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকে গেল। আমি এ অবস্থার জন্য প্রস্তুত ছিলাম এবং উপযুক্ত ব্যবস্থাও করে রেখেছিলাম। একটা বড় কাঠের সিঁড়ি হাতের কাছেই ছিল, সেটাকে তাড়াতাড়ি জানলার ধারে লাগিয়ে আমি উঠে পড়লাম, আমার পেছন পেছন অরুণও উঠে এল। তুজনে কোনমতে পাশাপাশি দাঁড়ানো যায়।

ঘরের ভেতরটা অন্ধকার হলেও ততক্ষণে আমাদের চোখে অন্ধকার অনেকটা সয়ে গেছে। মনে হল, সেই মেয়েটির খাটিয়ার ধারে যেন কালো পোশাক পরা একটা মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। আমরা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। পরক্ষণেই মূর্তিটা হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল তারপর মুখটা নিচু করল। আমাদের দিকে পেছন ফিরে থাকায় আমরা তার কার্যকলাপ দেখতে পাচ্ছিলাম না, তবে তার উদ্দেশ্য বুঝতে আমার কিন্তু এতটুকু কষ্ট হয় নি।

অরুণের মুখ দিয়ে ভয়বিহ্বল গোঙানির মত একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল। বিত্যুৎগতিতে লাফিয়ে উঠে মূর্তিটা আমাদের দিকে ফিরে তাকাল। অন্ধকারে আমরা শুধু তুটো জ্বলজ্বলে চোখ আর ছুরির ফলার মত ঝকঝকে তুটো দাঁত দেখতে পেলাম। আমাদের কাছ থেকে বাধা পেয়ে বোধ হয় ও হিংস্র হয়ে উঠেছে! কালো গাউনের মত পোশাক পরা মূর্তিটা তু-হাত ছড়িয়ে দিয়ে পাখির ডানার মত নাড়াল আর সঙ্গে সঙ্গে হতভম্ব হয়ে আমরা দেখলাম, মাটি ছেড়ে মূর্তিটা শূন্যে উঠে পড়েছে। এতক্ষণ যাকে আমরা মূর্তি বলে মনে করেছিলাম সেটা পাখির মত ডানা নাড়তে নাড়তে আমাদের দিকে এগিয়ে এল।

অরুণকে এক হ্যাচ্‌কা টান মেরে আমি তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম। অরুণ মাঝ-সিঁড়িথেকে প্রায় লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ল। বাদুড়টা বেরিয়ে হিংস্রভাবে আমাদের দিকে তেড়ে এল। আমি বন্দুক বাগিয়ে ধরতেই আমাদের আক্রমণ করা আর নিরাপদ নয় মনে করেই হয়তো বাদুড়টা তার গতি পরিবর্তন করল। এই মুহূর্তটির জন্যই আমি অপেক্ষা করছিলাম। অরুণও আমার পূর্ব নির্দেশমত তার পাঁচ ব্যাটারির শক্তিশালী টর্চের আলো ফেলল ওর ওপর, সঙ্গে সঙ্গে আমি ফায়ার করলাম। অব্যর্থ লক্ষ্য। বাদুড়টা শূন্যে দু'বার টাল খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল ধপ করে। আমরা ছুটে গেলাম। বাদুড়টা চিৎ হয়ে পড়ে আছে, বুকের কাছটা রক্তে ভরে উঠেছে, মুখটা হাঁ করা, দুটো তীক্ষ্ণ অস্বাভাবিক বড় দাঁত টর্চের আলোয় ঝকমক করে উঠল। আমার বন্দুকের গুলির শব্দে ওই ঘরের এবং আশপাশের লোকজন ছুটে এসেছিল। মৃত বাদুড়টাকে দেখে তাদের মুখে যে দারুণ আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠল তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। নিজেদের ভাষায় তারা কি সব বলাবলি করতে লাগল তার একবর্ণওআমরা বুঝলাম না।

শেষ পর্যন্ত ওদের একজন সাহস করে অরুণকে বলল, সাহেব, ওটাকে পুড়িয়ে ফেলো, ও পাখি নয়, পিশাচ!

আমরা ওর কথায় সম্মত হলাম। ওরাই গাছের শুকনো ডালপাতা এনে এক জায়গায় জড়ো করতে লাগল। এসব আয়োজন যখন হচ্ছিল আমরা তখন বাদুড়টার কাছ থেকে সরে গিয়ে ওদের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হলে আমরা ওদের বললাম বাদুড়টাকে টেনে আনতে, কিন্তু ওরা কেউ ছুঁতে রাজি হল না! অগত্যা আমি আর অরুণই এগিয়ে গেলাম। যেখানটায় ওটা পড়েছিল, অরুণ সেখানে টর্চের আলো ফেলল। আর সঙ্গে সঙ্গে তার হাত থেকে টর্চ পড়ে গেল। মুখ দিয়ে শুধু গোঁ গোঁ শব্দ বেরুতে লাগল।

আমিও দেখেছিলাম। টর্চের তীব্র আলোয় দেখেছিলাম বাদুড়টার

মৃতদেহ অদৃশ্য হয়েছে, আর ঠিক সেখানে মাটির ওপর চিৎ হয়ে পড়ে আছে মিঃ লেবঙের মৃতদেহ। বুকের কাছে একটা গোল দাগ, চার পাশ রক্তে ভিজে উঠেছে।

পাহাড়ি লোকগুলি এই দৃশ্য দেখে হাউমাউ করে উঠল। কেউ কেউ পালালো। আমি ওদের অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে মিঃ লেবঙের দেহটা শেষ পর্যন্ত দাহ করলাম! সব যখন ছাই হয়ে গেল, অন্ধকার তখন ফিকে হয়ে এসেছে। পূব আকাশে আলোর ছটা ফুটে উঠেছে —যেন অভিশপ্ত অন্ধকারের ভয়ঙ্করতা দূর করে দিনের প্রথম আলো আশীর্বাদের মত আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে।

আমার কাহিনী এখানেই শেষ। মিঃ লেবঙকেই আমি ভ্যামপায়ার বলে সন্দেহ করেছিলাম, কিন্তু কেন করেছিলাম তা না বললে হয়তো এই কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। রক্তচোষা বাদুড়ের কথা মনে জাগলেও, লেবঙের কতগুলি ব্যাপার আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। প্রথমেই তার সামনের দুটো দাঁত আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অত সরু ও ছুঁচলো দাঁত আমার কেমন যেন বিসদৃশ ঠেকেছিল।

দ্বিতীয়ত, গম্বুজ-ঘরে হঠাৎ একটা বাদুড় তার কাঁধের ওপর বসে যেমনভাবে তাঁকে আদর করেছিল, তা স্বাভাবিক ব্যাপার বলে আমার মনে হয় নি। আমার খটকা লেগেছিল। ওই বাদুড়টা ছিল মেয়ে বাদুড় (পরে আমি যুক্তি দিয়ে যা বুঝেছি), লেবঙ বাদুড়ের রূপ নিত বলেই ওই বাদুড়টা তার সহজাত অনুভূতি দিয়ে লেবঙকে পুরুষ বাদুড় রূপেই দেখত।

তৃতীয়ত, ওয়াং যখন কাচের পাত্রে লাল তরল পদার্থ এনে দিল, তখন আমার মনে সন্দেহ ছিল না যে বস্তুটা কাঁচা রক্ত। লেবঙ টমেটোর রস বলে আমাকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করলেও রক্ত আর টমেটোর রসের পার্থক্য বুঝব না, এমন বোকা আমি নই।

চতুর্থত, লেবঙ বেরিয়ে যাবার পর ওয়াংয়ের সন্ত্রস্ত ভাব আর

ছাগলটাকে মাটিতে কবর দেওয়া থেকে এটাই আমার মনে হয়েছিল যে ওয়াং তার মনিবের আসল রূপ জানে, তাই তার আচরণে অমন অদ্ভুত ভাব। তাকে সবসময় প্রাণভয়ে ত্রস্ত থাকতে হত,কোন কারণে হয়তো ওর পালাবার পথ ছিল না। লেবঙের পক্ষেও একজন অনুচর অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল, তাই নিজের স্বার্থেই ওকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। মৃত ছাগলটার রক্তই ওয়াং পাত্র ভরে লেবঙকে দিয়েছিল। লেবঙ নৈশ বিহারে বেরোবার পর ওয়াং ওটাকে কবর দেয়। আকাশের দিকে ও তাকাচ্ছিল,তার বাদুড় মনিব ফিরে আসার আগেইকাজটা সারতে হবে তাই। আমার অনুমান, প্রাণ ধারণের জন্য লেবঙ ছাগল কিংবা অন্য কোন জন্তুর রক্তপান করত। কিন্তু তারুণ্য বজায় রাখার জন্য মানুষ—বিশেষ করে তরুণ-তরুণীর রক্তই ছিল তার প্রধান অবলম্বন। আর যে কারণে আমি নিঃসন্দেহ হলাম যে লেবঙই ভ্যামপায়ার, সেটা ঘটল সেই রাত্রে লেবঙের বাড়ি থেকে ফেরার পথে। লেবঙ বাদুড় হয়ে ফিরছিল, পথে আমাকে দেখে সে আক্রমণ করে। আমি লাঠি দিয়ে সজোরে ওর ডানায় আঘাত করেছিলাম। পরদিন দেখলাম, লেবঙের ডান হাতে ব্যাণ্ডেজ, আমার আর কোন সন্দেহ রইল না।

আমাকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যেই লেবঙ বলেছিল যে তাকেও বাদুড় আক্রমণ করেছিল। আমার জেরার উত্তরে সে আরও বলেছিল যে,পড়ে যাবার পর বাদুড়টা তাকে ছেড়ে উড়ে যায়! ওটাও একটা মস্ত ভুল। অসহায় ভাবে পড়ে যাওয়া মানুষকে আক্রমণ করে তার গলায় দাঁত বসানোই হিংস্র ভ্যামপায়ারের প্রকৃতি, শিকারকে ছেড়ে উড়ে যাওয়া নয়। আমার মুখে রক্তচোষা বাদুড়ের থিওরি শুনে লেবঙ ঘাবড়ে যাবার ভান করে ড্রাকুলার কাহিনী টেনে এনেছিল। আসলে সে একটা চাল চেলেছিল, যাতে আমার সন্দেহ তার ওপর না পড়ে। ভ্যামপায়ার যদি সত্যিই কোন এক মানুষের মূর্তিতে থাকে, তবে ড্রাকুলার মত তাকেও দিনের বেলা দেখা যাবে না। অর্থাৎ লেবঙকে দিনের বেলা দেখা যায়,

সুতরাং সে সব সন্দেহের বাইরে। এখানে সে একটু বেশি চালাকি করে ফেলেছিল, কারণ আমি রক্তচোষা বাদুড়ের কথাই বলেছিলাম, মানুষ-রূপী ভ্যামপায়ারের প্রসঙ্গ একবারও তুলি নি। লেবঙ যেন আগ বাড়িয়েই নিজের মুখোশ খুলে দিল, অতি চালাকের যা হয়ে থাকে। আর যে ছোট্ট ঘটনাটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, তা হল মিঃ লেবঙের এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস আর রহস্যময় রোগের প্রাদুর্ভাব প্রায় সমসাময়িক। সব কিছু বিচার করে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে-ছিলাম যে লেবঙই ভ্যামপায়ার এবং তাকে শেষ করতে হলে বাদুড় অবস্থায় গুলি করে তাকে বিনাশ করতে হবে। একবার যার রক্ত পান করেছে, ভ্যামপায়ার আবার তার রক্তের লোভে ছুটে আসবেই। এটা আমার জানা ছিল, তাই ওই ফাঁদ পেতেছিলাম।

অতুল পিশাচ

শশিশেখর সান্যাল একতলায় তাঁর লাইব্রেরিতে গদী-আঁটা রিভলভিং চেয়ারে বসেছিলেন। সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপর একটা মোটা বিদেশী বই খোলা ছিল। বাঁ হাতের আঙুলের স্পর্শ ও অনুভূতির সাহায্যে 'ব্রেইল' পদ্ধতিতে তিনি সেটা পড়ছিলেন। শশিশেখর অন্ধ, অবশ্য মাত্র ক'বছর হল তিনি দৃষ্টি হারিয়েছেন। কর্মজীবনে অসাধারণ পাণ্ডিত্য তাঁকে সম্মানের শীর্ষে তুলে ধরেছিল। দৃষ্টি হারিয়েও তিনি মুষড়ে পড়েন নি, কঠিন অধ্যবসায়ের ফলে অল্প দিনের মধ্যেই তিনি 'ব্রেইল' শিখে নিয়েছেন, শিখে নিয়েছেন বললে ভুল হবে, রীতিমতো দক্ষতা অর্জন করেছেন।

শশিশেখরের বয়স ষাট, বিয়ে করেন নি। টেবিলের দক্ষিণ প্রান্তে তাঁর ভাইপো অসমঞ্জ বসেছিল। অসমঞ্জর বয়স পঁয়ত্রিশ। শশিশেখরের বড় ভায়ের ছেলে। বলতে গেলে, সান্যাল বংশের সেই একমাত্র প্রদীপ। অসমঞ্জ প্রাণীবিদ্যায় ডক্টরেট। এই অল্প বয়সেই তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমানে সে একটা জটিল গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত। তার বাবা এক নামী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ছিলেন, সুতরাং টাকা-পয়সার কোন অভাব তার নেই, রীতিমত ধনী বলা চলে। অসমঞ্জ ফাঁক পেলেই শশিশেখরের কাছে এসে কিছু সময় কাটিয়ে যায়। কাকা-ভাইপোর মধ্যে একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। শশিশেখরের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের প্রতি অসমঞ্জর গভীর শ্রদ্ধা, কাকার জ্ঞান-ভাণ্ডার

থেকে রসদ সংগ্রহ করে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে সে কখনই কুণ্ঠা বোধ করে না।

শশিশেখর বই পড়ছিলেন আর মাঝে মাঝে অসমঞ্জর সঙ্গে দু-চারটে কথা বলছিলেন। অসমঞ্জ হঠাৎ লক্ষ্য করল, তার কাকা বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে 'ব্রেইল' পদ্ধতিতে বই পড়ছেন আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ডান হাতের ডট্-পেনটাওএকটাসাদা কাগজের ওপর কি যেন লিখে চলেছে। অসমঞ্জ প্রথমে ভাবল, তার কাকা বাঁ হাতের আঙুলের অনুভূতি দিয়ে



যা পড়ছেন, হয়তো ডান হাতে ধরা কলম দিয়ে তাই লিখছেন। সে একটু কৌতূহলী হয়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে লেখাগুলি পড়তে লাগল ঃ

'শশিশেখর সান্যাল, শরদিন্দু সান্যাল (অসমঞ্জর বাবার নাম), বিনয়েন্দ্র সান্যাল (অসমঞ্জর ঠাকুর্দার নাম), বিমলেন্দু সান্যাল (অসমঞ্জর ঠাকুর্দার ভায়ের নাম), অসমঞ্জ সান্যাল, শশিশেখর সান্যাল, শরদিন্দু সান্যাল, বিনয়েন্দ্র সান্যাল, বিমলেন্দু সান্যাল, অসমঞ্জ···'

অসমঞ্জ বেশ একটু বিস্ময় অনুভব করল। তার কাকার বাঁ হাতের আঙুলযেমন দ্রুত চলছে,ডান হাতের ধরা ডট্-পেনটাওযেন তার সঙ্গে

পাল্লা দিয়ে সমান তালে লিখে চলেছে। পাঠ্যবস্তু আর লেখার মধ্যে কিন্তু আকাশ পাতাল প্রভেদ। অসমঞ্জ সবিস্ময়ে ভাবতে লাগল, এ কি সম্ভব! একই মানুষের পক্ষে একই সময় গভীর মনোযোগ দিয়ে একটা কিছু পড়া ও অন্য কিছু লিখে যাওয়াপ্রায় একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। তবে কি তার কাকা প্রকৃতির খেয়ালে এক অবিশ্বাস্য মানসিক উৎকর্ষতা লাভ করেছেন! অনেক সময় দেখা গেছে মানুষের কোনো ইন্দ্রিয়হানি ঘটলে, তার অপর এক ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি বৃদ্ধি পায়। যে অদ্ভুত ঘটনা সে অবলোকন করল, তা কি সেরকম কোনো ব্যাপার! শশিশেখর বই বন্ধ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতটাও থেমে গেল। অসমঞ্জ বইয়ের মলাটের ওপর চোখ বুলিয়ে দেখলো উদ্ভিদ বিজ্ঞানের ওপর লেখা একটা বই। তার কাকা যে নিজের অজ্ঞাতসারেই বই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রের মত লেখবার ক্ষমতা অর্জন করেছেন, সে বিষয়ে অসমঞ্জর মনে কোন সন্দেহ রইল না। বৈজ্ঞানিক চিন্তা দিয়ে সে এটাকে অবচেতন মনের একটা ক্রিয়া বলেই মনে করল।

অসমঞ্জ সেদিনকার মত বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরে এল। কাকুলিয়া রোডে তার পৈতৃক বাড়িতেসে একাই বাস করে, এখনও বিয়ে করেনি। তবে ঠিকএকা বলাও চলে না,চাকর রামু ও ঠাকুরছাড়া তার প্রাইভেট সেক্রেটারি দ্বৈপায়ন বসুও ওই বাড়িতেই থাকে। দ্বৈপায়ন অসমঞ্জরই সমবয়সী। এম. এস-সি. পাস করে সে যখন চাকরির চেষ্টায় ঘুরছিল, তখন আকস্মিক ভাবেই অসমঞ্জর সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। দ্বৈপায়নের চটপটে কথাবার্তা ও বুদ্ধিদীপ্ত চেহারায় অসমঞ্জ প্রীত হয়। লোভনীয় পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তার সেক্রেটারির পদ গ্রহণ করবার প্রস্তাব করতেই দ্বৈপায়ন এক কথায় রাজি হয়ে যায়। অসমঞ্জ তার নির্বাচনে যে ভুল করে নি, তা প্রমাণ হতে বেশী সময় লাগে নি। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই দ্বৈপায়ন অসমঞ্জর গবেষণার কাজ ও বৈষয়িক ব্যাপারে অপরিহার্য হয়ে ওঠে। অসমঞ্জর সব চিঠিপত্রের জবাব দেওয়া, রিপোর্ট

টাইপ করা, এমন কি তার বিষয়-আশয় দেখা-শোনাও সে দক্ষ সেক্রেটারির মত চালাতে লাগল। দু'জনের মধ্যে অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠতেও বেশী সময় লাগল না। এই ক'বছরে তা নিবিড় বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছে, সম্বোধন আপনি থেকে এসে দাঁড়িয়েছে তুমিতে।

নানান কাজে ব্যস্ত থাকায় অসমঞ্জ বেশ কিছুদিন শশিশেখরের সঙ্গে দেখা করতে পারে নি। তাই বলে কাকার অবচেতন মনের অদ্ভুত ঘটনাটি সে ভুলে যায় নি। প্রথম সুযোগেই সে এলগিন রোডে কাকার সঙ্গে দেখা করতে এল। এ ক'দিনেই কাকার বয়স যেন অনেক বেড়ে গেছে, একটা অস্থির অস্থির ভাব। বৈষয়িক ব্যাপারে চিঠি ডিকটেশন্ দিতে তিনি সেদিন ব্যস্ত ছিলেন, তাই বই পড়বার অবকাশ তাঁর ছিল না। অসমঞ্জ ফিরে এল, কিন্তু হাল ছাড়ল না। ক'দিন পর একটা ছুটির দিন দেখে সে দুপুরবেলা এলগিন রোডে চলে গেল। কাকার স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও সে একটু উদ্বিগ্ন হয়েছিল।

দোতলায় কাকার শোবার ঘরে গিয়ে সে দেখল, তিনি মাথার নিচে উঁচু করে বালিশ দিয়ে, অনেকটা হেলান দেওয়া অবস্থায়, খাটের ওপর ঘুমিয়ে আছেন। দু'হাতের আঙুলগুলি পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে বুকের ওপর আলগাভাবে রয়েছে। অসমঞ্জ ভাবল, সে একটা এক্সপেরিমেণ্ট করবে। সন্তর্পণে একটা খাতা আর একটা পেন্সিল সে বুকের কাছে ধরতেই একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। ডান হাতের আঙুলগুলো যেন সজীব হয়ে পেন্সিলের দিকে প্রসারিত হতে চাইল, কিন্তু বাম হাতের আঙুলের বন্ধনে থাকায় ওই প্রয়াস সফল হল না। পরক্ষণেই ডান হাতের আঙুলগুলো ধীরে ধীরে বাম হাতের আঙুলের কব্জা থেকে নিজেদের মুক্ত করে পেন্সিলটা তুলে নিল, তারপর খাতায় লিখতে শুরু করল ঃ

'সান্যাল বংশ শিক্ষা ও আভিজাত্যে নিশ্চয় গর্ব বোধ করতে পারে, কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের রক্তে যে অস্বাভাবিকতা বংশ-পরম্পরায় চলে আসছে তাও অস্বীকার করা যায় না।'

'তুমি কে ? অসমঞ্জ নিচু গলায় প্রশ্ন করল।

শশিশেখরের ডান হাত লিখল, 'তা জেনে তোমার কোন লাভ হবে না।'

'এসব কি আমার কাকাই লিখছেন ?' অসমঞ্জ আবার প্রশ্ন করে।

'দূর বোকা !'

'আমার পরিচিত কেউ ?'

'অধৈর্য হয়ো না, অসমঞ্জ, শিগগিরই তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে।'

'কবে ?'

'তোমার কাকা মারা গেলে পর—'

'কোথায় দেখা পাব ?

'কোথায় পাবে না ?'

'আমাদের বংশ সম্বন্ধে তুমি এত জান, তুমি কি আমার কোন পূর্বপুরুষ ?'

'অনুমান করতে বাধা নেই।'

পরের প্রশ্ন না করে অসমঞ্জ খাতায় লিখল, 'এখন কটা বাজে ?'

খাতায় লেখা পড়ল, 'তিনটে পঁচিশ। খাতা পেন্সিলটা সরিয়ে ফেল অসমঞ্জ, তোমার কাকা জেগে উঠে কিছু যেন টের না পান। আমরা যে এভাবে পরস্পরের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করছি তা অবশ্যই শশিশেখরের কাছে গোপন রাখতে হবে। বিদায়, আবার দেখা হবে।'

শশিশেখর যেন চমকে ঘুম ভেঙে জেগে উঠলেন। অসমঞ্জ অবশ্য তার আগেই কাকার ডান হাতের আঙুলে ধরা পেন্সিলটা সরিয়ে ফেলেছিল। শশিশেখর অসমঞ্জর উপস্থিতি টের পেয়ে যেন একটু ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন, 'কতক্ষণ এসেছো ?'

'এইতো…'

'বোসো। কিছুদিন ধরে ঘুমের মধ্যে এমন সব বিচ্ছিরি স্বপ্ন দেখি, মাথামুণ্ডু নেই।...

'হয়তো ভাল ঘুম হচ্ছে না। ডক্টর চৌধুরীকে একবার কল্ দেব ?'

'না।' একটু থেমে শশিশেখর বলতে থাকেন, 'এমন সব অদ্ভুত স্বপ্ন ! অন্ধকার দেশ, মানুষ-জন, ঘর-বাড়ি সবই যেন আবছা অন্ধকারে ঢাকা। কাকা—'

'কাকা !'

'হ্যাঁ, তোমার ঠাকুর্দার ভাই, আমার কাকা।...'

'কিন্তু তাঁর কথা বলছেন কেন ?'

শশিশেখর সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিলেন না। মুহূর্তকাল নিঃশব্দে কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন, 'তুমি বড় হয়েছো, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছো, এখন আর তোমার কাছে গোপন রাখা উচিত হবে না। আমার কাকা, অর্থাৎ বিমলেন্দু সান্যাল, দুর্দান্ত প্রকৃতির ছিলেন। হিংস্র, নিষ্ঠুর, ধূর্ত। এক কথায় উচ্ছৃঙ্খল, বেপরোয়া মানুষ। শেষ পর্যন্ত তিনি সামান্যকারণে আপন মামাতো ভাইকে ছুরি মেরে হত্যা করেন। বিচারে তাঁর ফাঁসী হয়েছিল। পর পর ক'দিন আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখেছি। এই এখন তন্দ্রার মধ্যেও..., তুমিও যেন কেমনভাবে তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছ মনে হল। অসমঞ্জ, জীবনের পথ কর্দমাক্ত, পিচ্ছিল, শত প্রলোভনেও সত্যকে ত্যাগ কোর না। তোমার ঠাকুর্দার ভাই...'

এক দমক কাশি ওঠায় শশিশেখর তাঁর কথা শেষ করতে পারলেন না, কিন্তু অসমঞ্জ অবাক হয়ে দেখল, তাঁর ডান হাত পাশেই রাখা পেন্সিলটা চট করে খুলে খাতায় খস্খস্ করে কি যেন লিখল। শশিশেখর ব্যাপারটা জানতেই পারলেন না। লেখা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই পেন্সিলটা আবার তাঁর হাতের আঙুল থেকে খসে পড়ল। অসমঞ্জ খাতাটা সরিয়ে এনে পড়ল ঃ

'শশিশেখরের কথায় কান দিও না। আমরা ছ'জনে বন্ধু, তাই না অসমঞ্জ ?'

অসমঞ্জ স্তম্ভিত হয়ে গেল। তবে কি···

তিনদিন পর অসমঞ্জর টোকিওতে এক আন্তর্জাতিক প্রাণীবিদ্যা সম্মেলনে যোগ দিতে যাবার কথা, কাকার কাছে তাই সে বিদায় চাইল। শশিশেখর তাকে শুভ কামনা জানিয়ে বললেন, 'আমার দিন ঘনিয়ে এসেছে, অসমঞ্জ। পরপারের ডাক আমি যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। তোমার সঙ্গে হয়তো আমার এই শেষ দেখা। একটা কথা, বংশ-মর্যাদায় আমরা কুলীন, শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কৃতিতে তিন পুরুষ ধরে আমরা সমাজের বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছি, কিন্তু দোষ-ত্রুটি নিয়েই মানুষ, আমরাও তার উর্ধ্বে নই। একটা খামখেয়ালী মনোবৃত্তি, ইংরেজীতে যাকে বলে 'এক্সেনট্রিসিটি', তা আমাদের বংশের মজ্জাগত দোষ। তুমি বিয়ে করতে আর দেরী কোর না। বুদ্ধিমতী, বাস্তবজ্ঞান সম্পন্না একটি মেয়েকে বধূ নির্বাচিত কর। আর একটা কথা, যদি আমাদের আর দেখা না হয়, তাই বলে রাখছি, তোমার টাকা-পয়সার অভাব নেই। আমার উইলে আমার সব সম্পত্তি শিক্ষার প্রসারে ব্যয় করবার নির্দেশ দিয়েছি, কিন্তু আমার মূল্যবান আর দুষ্প্রাপ্য বইগুলো তোমার কাজে লাগতে পারে ভেবে সেগুলো তোমাকে দিয়ে গেলাম।

'ওঃ আরও একটা কথা—শেষ সময়ে মানুষ নিজের ওপর শাসন হারিয়ে ফেলে, অসঙ্গত আবদার কিংবা দাবি করে, সে সবে কান দিও না। গুড্ বাই, অসমঞ্জ।'

শশিশেখর তাঁর ডান হাতটা ভাইপোর দিকে বাড়িয়ে দিলেন। অসমঞ্জ প্রসারিত সেই হাতটা নিজের মুঠির মধ্যে মৃদুভাবে চেপে ধরল। মুঠো আলগা করার পূর্বমূহূর্তে শশিশেখরের ডান হাতের চাপের মধ্যে একটা অদ্ভুত অনুভূতি অসমঞ্জর শরীরে যেন বিদ্যুৎ তরঙ্গ বইয়ে দিল। মুহূর্তের জন্য তার মনে হল, যেন তার কাকার ডান হাতটা বৃদ্ধের হাত

নয়। শক্ত-সমর্থ কোন জোয়ানের সঙ্গে সে করমর্দন করছে, আর স্পর্শেও যেন একটা অন্তরঙ্গতার ছোঁয়া।

টোকিও থেকে দিন পনের পর ফিরে অসমঞ্জ শশিশেখরের মৃত্যু সংবাদ শুনল। অসমঞ্জর মনে হল, কাকার মৃত্যু অনেকটা আকস্মিক। শেষ দিকে তিনি যেন মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন। কাকার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকারের সময় তাঁর কথাবার্তা থেকে অন্তত তাই মনে হয়। শশিশেখরের উইলে তাঁর সম্পত্তির তত্ত্বাবধান এবং শিক্ষা ও রিসার্চের উন্নতিকল্পে, সুষ্ঠু ব্যয়ের উদ্দেশ্যে একটি ট্রাষ্ট গঠন করার নির্দেশ ছিল, অসমঞ্জকে তিনি সেই ট্রাষ্টের অন্যতম অছি নিযুক্ত করেছেন।

কাকার আজীবনের বিরাট গ্রন্থ-সংগ্রহ নিয়ে অসমঞ্জ বেশ ফাঁপরেই পড়ল। তার নিজের বাড়ির লাইব্রেরি ঘরটা প্রকাণ্ডই বলতে হবে। তার বাবার পড়ার নেশা ছিল। আলমারি ভর্তি সব বই ছাড়াও তিনি ঘরের চারিদিকে গ্যালারির মত সিমেণ্ট বাঁধানো তাক তৈরী করিয়ে ছিলেন, সারি সারি তাকগুলো দেয়াল জুড়ে ঘরের কড়িকাঠ পর্যন্ত উঁচু। একটা বড় কাঠের মই বেয়ে ওপরের তাকগুলো থেকে বই নামাতে হয়।

কাকার বইগুলো ঠিকমত গুছিয়ে রাখা অসমঞ্জর কাছে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। দ্বৈপায়নই পরামর্শ দিল, সাধারণ গ্রন্থাগারে যেমন বড় বড় কাঠের তাকওলা বই রাখার আলমারি থাকে, সেই ধরনের বেশ কিছু তৈরি করিয়ে আপাত সমস্যার সমাধান করা হোক। সেই ব্যবস্থাই হল। প্রকাণ্ড লাইব্রেরি ঘরটা বইয়ে ভরে গেল।

কয়েকদিন পরের কথা। সন্ধ্যেবেলা অসমঞ্জ তার বসবার ঘরে বসে

একটা বই পড়ছিল। দ্বৈপায়ন এসে ঘরে ঢুকল। একটা বিশেষ দরকারে তাকে সিঁথি যেতে হবে, ফিরতে রাত হতে পারে। অসমঞ্জকে সে বলল, 'আজকের সব চিঠিপত্র লাইব্রেরির টেবিলের ওপর চাপা দিয়ে রেখেছি। কয়েকটা ব্যক্তিগত চিঠিও আছে। হ্যাঁ, আর একটা হাত দেড়েকের মত লম্বা কাঠের বাক্স পার্শেলে এসেছে, ভেতরে একটা জ্যান্ত প্রাণী আছে মনে হচ্ছে। যেমন লাফাচ্ছে আর পায়ের নখ দিয়ে আঁচড়াচ্ছে, তাতে মনে হয়, ওটার ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে। আমি আর ওটা খুলি নি। আচ্ছা, তাহলে চলি।'

দ্বৈপায়ন রাত্রের খাওয়াটা সিঁথিতেই সেরে নেবে বলেছিল, তাই অসমঞ্জ ন'টার মধ্যে খেয়ে নিল। রামুকে লাইব্রেরি ঘরে কফি দিতে বলে চিঠিপত্র দেখবার জন্য সে ওই ঘরের দিকে পা বাড়াল।

ধূমায়িত কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে রামু ঘরে ঢুকতেই অসমঞ্জ তাকে একটা স্ক্রু-ডাইভার আনতে বলল, কাঠের বাক্সর চারদিক স্ক্রু দিয়ে আটকানো ছিল। স্ক্রু-ডাইভার ছাড়া খোলা মুশকিল। স্ক্রু-ডাইভার এনে রামু বলল, 'পিওন বলছিল, পোষ্ট অফিস থেকে বাক্সর ওপরে কয়েকটা ফুটো করে দিয়েছে। ভেতরে যে জ্যান্ত প্রাণীটা আছে, সেটা নাকি তা না হলে দম বন্ধ হয়ে মারা যেত।'

গবেষণার জন্য অসমঞ্জর নানান্ রকম জীব-জন্তুর প্রায়ই প্রয়োজন হয়। তার ল্যাবরেটরি চিড়িয়াখানার একটা ক্ষুদে সংস্করণ বললে অত্যুক্তি হবে না। অসমঞ্জ মনে মনে ঠিক করল, দ্বৈপায়নকে বলবে, যে কোম্পানী প্রাণীটা পাঠিয়েছে তাদের কড়া একটা চিঠি লিখতে। এ ধরনের অসতর্কতা ক্ষমা করা যায় না। বাক্সের স্ক্রুগুলি খুলে সে একটা মোটা বই ঢাকনার ওপর চাপা দিল,তারপর ল্যাবরেটারি থেকে একটা খাঁচা আনতে গেল। খাঁচা নিয়ে লাইব্রেরির দরজায় ফিরে আসতেই একটা কিছু পড়ার শব্দ হল, মেঝের ওপর দিয়ে যেন কিছু চলে গেল। অসমঞ্জ দেখল, মোটা বইটা মাঠিতে পড়ে আছে আর বাক্সের ভেতরটা

শূন্য। বইটা তুলে ঝাড়তে ঝাড়তে সে ভাবল, প্রাণীটার শক্তি তো কম নয়, এই মোটা বইটা ফেলে দিয়েছে।

প্রাণীটাকে খুঁজে বের করা সহজ ব্যাপার নয়। বইয়ের পাহাড়ের মধ্যে কোথায় লুকিয়ে আছে কে জানে! বইয়ের তাকের পেছনে সে ওটার নড়া-চড়ার শব্দ শুনতে পেল, কিন্তু শব্দ লক্ষ্য করে এগুতেই সে বুঝতে পারল, ওটা অন্য একটা শেলফের পেছনে আশ্রয় নিয়েছে। হতাশ হয়ে সে তার চেয়ারে ফিরে এসে চিঠিপত্রগুলো পড়তে লাগল। হঠাৎ খুট্ করে একটা শব্দ হল, যেন কেউ স্যুইচ নিভিয়ে দিল আর সঙ্গে সঙ্গে ঘর অন্ধকার হয়ে গেল।

আলো কে নেভাল? বেশ আশ্চর্য হয়েই অসমঞ্জ দেয়ালে যেখানে স্যুইচ-বোর্ড আছে, অন্ধকারে সেদিকে এগুলো। দু-পা এগিয়েই সে থেমে গেল। ঘরের অপর প্রান্তে একটা শব্দ হচ্ছে, অনেকটা বুকে ভর দিয়ে চলার মত শব্দ। সে তাড়াতাড়ি স্যুইচ টিপতেই ঘর আলোতে ভরে উঠলো, কিন্তু অসমঞ্জ কিছু দেখতে পেল না, ওই অল্প সময়ের মধ্যেই প্রাণীটা আবার আত্মগোপন করেছে।

অসমঞ্জ আবার তার চেয়ারে ফিরে এল। ঘরটা বড় ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে, কেমন যেন একটা বিষাদের ছায়া। পেছন দিকের উঁচু গ্যালারি থেকে ধপ্ ধপ্ করে দুটো মোটা বই মাটিতে পড়ল। অসমঞ্জ ফিরে তাকাতেই একটা একটা করে আরও দুটো বই পড়ে গেল। অসমঞ্জ অস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'ব্যাটা, তোকে উপোস করিয়ে রাখব, এই তোর ঠিক শাস্তি। জল ছাড়া জীবদেহের রাসায়নিক রূপান্তর তোর ওপর দিয়েই পরীক্ষা করব।'

তাকে যেন ব্যঙ্গ করে আরও গোটা কয়েক বই মাটিতে পড়ল।

অসমঞ্জ আবার তার চিঠিপত্র নিয়ে বসল। শেষ যে চিঠিটা সে পড়েছিল, সেটা তাদের পরিবারের অ্যাটর্ণির চিঠি। চিঠিতে তার কাকার মৃত্যুর বিবরণ এবং উইলের ধারা সম্বন্ধে নানান্ মন্তব্য ছিল।

চিঠির শেষের দিকটা বড়ই অদ্ভুত।

'আপনার কাকার একটা অনুরোধ (অসমঞ্জ পড়তে লাগল) আমাদের কাছে বড়ই আশ্চর্য লেগেছে। শশিশেখর সান্যালের নির্দেশ ছিল যে তাঁর মৃত্যুর পর খুব সাধারণভাবে তাঁকে যেন দাহ করা হয়, ফুল দিয়ে মৃতদেহ সাজানোর কোন প্রয়োজন নেই। তাঁর মৃত্যুর আগের দিন আমরা তাঁর আর একটা চিঠি পাই।

সেই চিঠিতে তিনি তাঁর পূর্ব নির্দেশ সম্পূর্ণ বাতিল করে দিয়েছিলেন। তিনি ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন যে, তাঁর দেহ যেন মূল্যবান পালঙ্কে (যেটাতে তিনি শুতেন) বহন করা হয়, নিউ মার্কেট থেকে বাহারী ফুল এনে তাঁর সর্বাঙ্গ যেন ঢেকে দেওয়া হয়, আর তাঁর ডান হাতটা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে যেন আপনাকে পাঠানো হয়। এর অন্যথা যেন কিছুতেই না হয়।'

অসমঞ্জ চিঠিটা হাতে করে হতভম্বের মত বসে রইল। কাকার শেষ কথা হঠাৎ তার মনে পড়ল, 'শেষ সময় মানুষ নিজের ওপর শাসন হারিয়ে ফেলে, অসঙ্গত আবদার কিংবা দাবি করে—সে সবে কান দিও না।'

পেছনের গ্যালারিতে কেউ যেন হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে। চোর নাকি? একটা জানলার পর্দা কেউ যেন সরিয়ে দিল। নিশ্চয়ই কেউ গ্যালারিতে আছে। পাশের জানলার পর্দাটাও সরে গেল, আর বাইরে থেকে এক ঝলক চাঁদের আলো গ্যালারির মাঝখানে অন্ধকার জায়গাটা আলোকিত করে তুললো।

অসমঞ্জ হাতে একটা ভারি পেপার-ওয়েট নিয়ে পা টিপে টিপে শব্দ লক্ষ্য করে এগুলো আর সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়বার ঘরের আলো নিভে গেল। মেঝের ওপর দিয়ে আবার বুকে হেঁটে চলার শব্দটা শোনা গেল। চাঁদের আলোয় অসমঞ্জ নিঃশব্দে সুইচ বোর্ডের দিকে এগিয়ে গেল। বিরাট ঘর তাই আলো ও পাখা মিলিয়ে গোটা আষ্টেক

পয়েন্ট আছে। সাধারণতঃ অসমঞ্জ তার পড়াশুনা ও কাজকর্মের জন্য যে টেবিল চেয়ার ব্যবহার করে, ঠিক তার ওপর কড়িকাঠ থেকে ঝোলান আলোটাই জ্বালায়। ওটা হাই পাওয়ারের বাল্ব হলেও সমস্ত ঘরের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। পুরো ঘর আলোকিত করতে হলে সব ক'টা লাইট জ্বালানো দরকার হয়ে পড়ে। অসমঞ্জ পায়ে পায়ে স্যুইচ বোর্ডের কাছে গিয়ে পর পর সব ক'টা লাইটের স্যুইচ টিপল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘর আলোয় ঝলমল করে উঠল।

সেই আলোয় অসমঞ্জ যা দেখল, তাতে তার মাথার চুল খাড়া হয়ে ওঠার উপক্রম। সে দু'চোখ কচ্‌লে নিল, সে কি স্বপ্ন দেখছে? যেখানে সে দাঁড়িয়ে আছে, তার থেকে হাত দশেক দূর দিয়ে একটা হাত— মানুষের হাত, সর্‌ সর্‌ করে অনেকটা বিছের মত বুকে ভর দিয়ে দ্রুত চলে যাচ্ছে। আসলে আঙুলগুলোই হাতটাকে চালনা করছে। কারণ আঙুলগুলো ঘন ঘন প্রসারিত হচ্ছে ও পরক্ষণে মুড়ে যাচ্ছে এবং ওই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতটা এগোচ্ছে। হ্যাঁ, আঙুলগুলোই যে হাতটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই।

অসমঞ্জ স্তম্ভিতের মত এই বিচিত্র ঘটনা দেখতে লাগল। কাকার বইগুলো যেসব নতুন কাঠের র‍্যাকে রাখা হয়েছিল, তাতেই একটার ফাঁকে হাতটা অদৃশ্য হয়ে গেল। অসমঞ্জ প্রায় দৌড়ে হাতটা যেদিকে অদৃশ্য হয়েছে, সেদিকে ছুটে গেল। একটা র‍্যাকের বুক সমান উঁচু তাক্‌ থেকে একটা বাঁধানো মোটা বই পড়ে গেল, আর সেইফাঁকের মধ্যে খস্‌ খস্‌ করে একটা শব্দ শোনা গেল। অসমঞ্জ বুঝল যে হাতটা ওই ফাঁকের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। সে তার চেয়ারে ফিরে এল। হাতটাকে ঘাঁটাঘাঁটি করতে তার আর ভরসা হল না। দ্বৈপায়ন ফিরে আসুক তারপর যা হয় করা যাবে। একটা হাত সজীব ভাবে চলে বেড়াচ্ছে, এ কি করে সম্ভব! অ্যাটর্ণির চিঠিতে তার কাকার অন্তিম নির্দেশ অনুযায়ীই কি ওটা তার কাছে পাঠানো হয়েছে? কাকার সঙ্গে শেষ

সাক্ষাৎকারের সময় ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর ডান হাত যা লিখেছিল সেটা অসমঞ্জর মনে পড়ল, 'তোমার কাকার মৃত্যুর পর আমাদের দেখা হবে।' তবে কি··· ! অসমঞ্জর শিরদাঁড়া দিয়ে একটা হিম শিহরণ বয়ে গেল।

বাইরে দ্বৈপায়নের কণ্ঠস্বর শুনে তার মনে বল ফিরে এল। দারুণ একটা স্বস্তি সে অনুভব করল। দ্বৈপায়ন ঘরে ঢুকে একটু বিস্মিত কণ্ঠে বলল, 'কি ব্যাপার, এতোগুলো আলো জ্বলছে কেন ?' তারপরই তার দৃষ্টি পড়ল মাটিতে পড়ে থাকা বইগুলোর ওপর। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সে অসমঞ্জর মুখের দিকে তাকালো।

'আমার কাকার ডান হাতটা', অসমঞ্জ এক নিশ্বাসে বলেই থেমে গেল। তারপর বলল, 'তোমাকে কি করে বোঝাবো জানি না, তখন থেকে সেই হাতটা আমার সঙ্গে মসকরা করছে। ইউ হ্যাভ গট টু হেলপ মি টু ক্যাচ্ ইট।'

'কি আবোল-তাবোল বকছ, নেশা কর নি তো ?'

'নেশা না তোমার মাথা,' অসমঞ্জ একটু রাগত কণ্ঠে বলে, 'ওই র‍্যাকের কোকরের মধ্যে হাতটা লুকিয়ে আছে, আমি বাজে কথা বলছি কিনা নিজেই গিয়ে দেখ।'

অসমঞ্জর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই র‍্যাক থেকে বই সরাবার শব্দ হল। দ্বৈপায়ন বলল, 'ইঁদুর।'

সে এগিয়ে গিয়ে র‍্যাকের সামনে দাঁড়ালো, তারপর দু-একবার মুখ দিয়ে হুশ্ হুশ্ শব্দ করল, কিন্তু ওদিক থেকে আর কোন সাড়া-শব্দ নেই। জামার আস্তিন গুটিয়ে দ্বৈপায়ন ঠাসা বইয়ের মধ্যে যে ফাঁক সৃষ্টি হয়েছিল তার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল।

'হ্যাঁ, কিছু একটা আছে, আমাকে যেন চিমটি কাটছে। আরে, আরে···' সে তাড়াতাড়ি হাতটা টেনে নিল।

'কি হল ?' অসমঞ্জ ব্যগ্রকণ্ঠে শুধোয়।

'আমার হাত ধরে টানছিল। মনে হল যেন মানুষের শক্ত আঙুল

আমার কব্জি চেপে ধরেছে মাই গড্।'

'ওটাকে কি করে বার করা যায়?'

'জাল দিয়ে ঘিরে দিলে কেমন হয়?'

'জাল দিয়ে ধরা যাবে না। ভীষণ ধূর্ত হাতটা। কি তাড়াতাড়ি মেঝের ওপর দিয়ে চলে গেল যদি দেখতে!'

'এক কাজ করা যাক্, এই শেলফ্ থেকে কিছু বই নামিয়ে ফেলি। ফাঁকটা বড় হয়ে গেলেই ওটাকে বন্দী করতে অসুবিধে হবে না।'

কথামত তারা কয়েকটি বই নামিয়ে ফেলল। হাতটা যেন পালাবার চেষ্টা করছে। ওর আঙুলগুলো ছটফট করছে দেখা গেল। দ্বৈপায়ন তার বলিষ্ঠ দুই হাত দিয়ে সেই অদ্ভুত জিনিসটাকে চেপে ধরে বলল, 'আরে, এটার মাংসপেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠেছে। জোর আছে তো! সত্যিই তো একটা হাত! আমিও তোমার মত নেশা করে প্রহেলিকা দেখছি নাকি?'

অসমঞ্জ রাগত কণ্ঠে বলল, 'বোকার মত কথা বোলো না। ওটাকে বের করে নিয়ে এস, আবার বাক্সর মধ্যে ঢুকিয়ে ঢাকনা বন্ধ করে বন্দী করতে হবে।'

হাতটাকে বের করে আনা দ্বৈপায়নের পক্ষে খুব সহজ হল না। বাইরে আনা মাত্র দু'জনে জোর করে ওটাকে বাক্সর মধ্যে ঢুকিয়ে কাঠের ঢাকনা আবার স্ক্রু দিয়ে আটকে দিল। কপালের ঘাম মুছে অসমঞ্জ তার সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ডান দিকের চতুর্থ ড্রয়ারে বাক্সটাকে ঢুকিয়ে চাবি দিয়ে দিল। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দ্বৈপায়ন বলল, 'বারটা পঁয়ত্রিশ, চমৎকার কাটল সময়টা। এবার তোমার কাকার হাতের কথা কি বলছিলে খুলে বল তো।'

দু'জনে সারা রাত লাইব্রেরিতে বসেই কাটিয়ে দিল। অসমঞ্জ গোড়া থেকে সব কিছুই দ্বৈপায়নকে বলল। শুনতে শুনতে দ্বৈপায়নের দু' চোখ কপালে ওঠার যোগাড়। অসমঞ্জর চোখ থেকে ঘুম উবে

গিয়েছিল। দোতলার বারান্দা পেরিয়ে একা শোবার ঘরে যেতে হবে ভাবতেই তার গা ছম্‌ছম্‌ করে উঠছিল।

সকাল বেলা চা-পর্ব সেরে দু'জনে আবার লাইব্রেরিতে গিয়ে ঢুকল। দিনের আলোয় ঘরের গত রাত্রের বিভীষিকা যেন কর্পূরের মত উবে গেছে। দ্বৈপায়নই বলল, 'হাতটা আর একবার দেখা যাক্, আমরা দু'জনেই কাল রাত্রে নেশা করেছিলাম কিনা তা-প্রমাণ হবে।

'ভাল কথা, এই নাও চাবি।' অসমঞ্জ বলল।

দ্বৈপায়ন চাবি দিয়ে ড্রয়ার খুলে লম্বা চৌকো কাঠের বাক্সটা টেবিলের ওপর রাখল। দু'জনেই বাক্সটার দিকে তাকিয়ে কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

'কি হল?' অসমঞ্জ প্রশ্ন করে।

'আমি ভাবছিলাম তুমিই বোধহয় ঢাকনা খুলবে।'

'কেন, ওটা দেখবার ইচ্ছে তো তোমারই হয়েছে।'

'বেশ, তোমার যদি ভয় করে তবে আমিই খুলছি।'

দ্বৈপায়ন স্ক্রু খুলে ঢাক্‌না আলগা করল, তারপর সেটাকে টেবিলের ওপর রেখে বাক্স থেকে হাতটা বের করে আনল। দিনের বেলায় হাতটা দেখে কনুই থেকে বিচ্ছিন্ন একটা সাধারণ হাত ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। গত রাত্রে ওটা যে তাদের নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে তা কে বলবে!

'হাতটা কি মড়ার হাতের মতন ঠাণ্ডা?' অসমঞ্জ একটু যেন ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করে।

'ঈষদুষ্ণ। তোমার আমার শরীরের উত্তাপের চাইতে কম বলেই মনে হচ্ছে। এখন তো হাতটাকে বেশ নরম লাগছে। জানি না, কোন্ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এটাকে এত টাটকা রাখা হয়েছে। তোমার কি মনে হয় এটা তোমার কাকার হাত?'

'হ্যাঁ, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। অনামিকায় ওই কাটা দাগটা ভুল হবার নয়। ওটাকে আবার বাক্সে ঢাকা দাও দ্বৈপায়ন, আমি সহ্য করতে পারছি না। ঢাকনায় স্ক্রু লাগাতে হবে না, আমি ড্রয়ারে চাবি লাগিয়ে দিচ্ছি, ওটা আর বেরুতে পারবে না।'

একটা বীভৎস পরিবেশে অসমঞ্জর স্নায়ু ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছিল। দ্বৈপায়নকে সঙ্গে নিয়ে সে তার মার্সেডিসে দিন কয়েকের জন্য দীঘার উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পড়ল। সেখানে সম্পূর্ণ বিশ্রাম আর মুক্ত পরিবেশে তার মন হাল্কা হয়ে গেল। একটা দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে সে কলকাতায় ফিরল। বাক্সসুদ্ধ হাতটাকে সে গঙ্গায় বিসর্জন দেবে।

কলকাতায় ফেরামাত্র রামু একটা সমস্যা নিয়ে তার কাছে উপস্থিত হল। রান্নার ঠাকুর জবাব দিয়েছে। সে নাকি বলছে, বাড়িতে ভূতের উপদ্রব শুরু হয়েছে। অসমঞ্জ একটু চমকালো, কিন্তু মুখে বলল, 'ঠাকুর আজকাল গাঁজা খাচ্ছে নাকি?'

রামু বলে, 'আমিও তো বলেছিলাম।'

রামু হঠাৎ মাথা চুলকোতে থাকে।

অসমঞ্জ একটু বিস্মিত হয়েই বলে, 'কি হল?'

রামু বলে, 'আজ্ঞে বাবু, আমার একটা অন্যায় হয়ে গেছে। আপনার চিঠি পেয়ে লাইব্রেরি ঘর থেকে আমি টেবিলের ড্রয়ার খুলে কাঠের বাক্সটা বের করেছিলাম। একজন চাবিওলা ডেকে চাবি খুলতে হয়েছিল। বাক্সর মধ্যে যে ইঁদুরটি ছিল, সেটা ভীষণ লাফালাফি করছিল। না খেতে পেয়ে যে মরে যায় নি, তাই আশ্চর্যি। আমি বাক্সটাকে ড্রয়ার থেকে বের করে একটা খাঁচা এনে ঠিক করছি, এমন সময় ওটা কেমন করে জানি না বাক্স থেকে বেরিয়ে পালিয়ে গেল।'

অসমঞ্জ এতক্ষণ হাঁ হয়ে রামুর কথা শুনছিল। তার বক্তব্য শেষ হতেই সে বলল, 'কি বলছিস তুই? আমি তো কোনও চিঠি লিখি নি।'

'কিন্তু চিঠিটা যে আমি লাইব্রেরি ঘরে টেবিলের কাছে মেঝের ওপর কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। আপনারা যেদিন চলে গেলেন সেদিন বিকেল বেলা ঘর ঝাড়-পোঁছ করবার সময় ওটা আমার চোখে পড়ে। এইতো আমার পকেটেই রয়েছে।'

জামার পকেট থেকে সে ছোট্ট একটা চিরকুট বের করে অসমঞ্জর হাতে দিল। অসমঞ্জ সবিস্ময়ে দেখল, লেখাটা ঠিক তারই হাতের লেখার মত। পেন্সিলে লেখা চিরকুটটা সে পড়তে লাগল ঃ

'রামু, লাইব্রেরিতে আমার টেবিলের ডানদিকের ড্রয়ারগুলো চাবি দেওয়া আছে। চাবিটা যেমন করে হোক খুলে ফেল। চতুর্থ ড্রয়ারে যে কাঠের বাক্সটা আছে সেটা বাইরে রেখে দে। আর কিছু তোকে করতে হবে না। অবশ্যই কাজটা করিস।'—অসমঞ্জ সান্যাল।

অসমঞ্জ স্তম্ভিত হয়ে গেল। তার পাশেই দ্বৈপায়ন বসেছিল, সে হাত বাড়িয়ে চিরকুটটা নিল। অসমঞ্জই রামুকে আবার প্রশ্ন করল, 'তুই খাঁচা আনার পর ওটা পালিয়ে গেল ?'

'আমি খাঁচাটা ঠিক করছি, এমন সময় ইঁদুরটা বাক্স থেকে লাফ মেরে বেরিয়ে পালিয়ে গেল।

'ইঁদুর ! তুই নিজের চোখে দেখেছিলি ?'

'আজ্ঞে,' রামু মাথা চুলকিয়ে বলে, 'ঠিক দেখি নি, বাক্সটার দিকে পেছন ফিরে খাঁচা ঠিক করছিলাম, শব্দ শুনে পেছন ফিরেছি, ততক্ষণে ওটা একটা আলমারির কাছে চলে গিয়েছিল। বেলাও পড়ে এসেছিল, অন্ধকারে ভাল দেখা যাচ্ছিল না।'

'রঙটা কেমন ?'

'অনেকটা তামাটে বলে মনে হয়েছিল। ওটা কেমন অদ্ভুতভাবে হেঁটে যাচ্ছিল, আর ল্যাজ ছিল না।'

'তুই ওটাকে ধরবার চেষ্টা করিস নি ?'

'করেছিলাম, কিন্তু চোখের পলকে ওটা লুকিয়ে পড়ল। আমি

ইঁদুর ধরার জাঁতিকলটা পেতে লাইব্রেরীর দরজা বন্ধ করে রেখে ছিলাম। মানদা (ঠিকে ঝি) পরদিন সকালে ঘর মোছবার জন্য ঘরে ঢুকে দরজা আর বন্ধ করে নি, ওই ফাঁকে নিশ্চয় ওটা পালিয়েছে।'

'তোমার কি মনে হয়, ঠাকুর ওটা দেখেই ভূতের ভয় পেয়েছে ?'

'আজ্ঞে, ঠিক তা নয়। ঠাকুর বলছে, সে একটা হাতকে রান্নাঘর থেকে মাছ নিয়ে যেতে দেখেছে। মানদাও নাকি একদিন অন্ধকারে সিঁড়ির মুখে কি একটা নরম জিনিস মাড়িয়ে দিয়েছিল। পা সরিয়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে হয়েছিল যে কয়েকটা আঙ্গুল যেন তার পায়ের গোড়ালি চেপে ধরেছে। চিৎকার করে উঠতেই ওটা ওকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। মানদার মেয়ে কমলিও মাঝে মাঝে মায়ের সঙ্গে কাজে জোগান দিতে আসে। সেদিন বাসন মাজার পর ও কলে হাত ধুয়ে শাড়ির আঁচল দিয়ে হাত মুছছিল। তখন সন্ধ্যে। কমলি গান করছিল আর অন্যদিকে তাকিয়ে হাত মুছছিল, হঠাৎ ওর খেয়াল হল যে ও অন্য কারও হাত মুছছে, বেশ ঠাণ্ডা হাতটা।'

'যত সব গাঁজাখুরি গল্প !' দ্বৈপায়ন এবার বলে উঠল।

'তুই নিশ্চয় এসব বিশ্বাস করিস না ?' অসমঞ্জ আচমকা রামুর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে।

'আমি ? আজ্ঞে না, আমি হাত-টাত কিছু দেখি নি।'

'কিছু শুনিসও নি নিশ্চয় ?'

'আজ্ঞে, মাঝে মাঝে বাইরের কলিং বেলটা বেজে ওঠে। দরজা খুলে আমি কাউকে দেখতে পাই না। রাত্রে আপনার শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করতে গিয়ে দেখি আগেই যেন কে বন্ধ করে রেখেছে। আপনার খাঁচায় কত রকম জীব-জন্তু আছে। কোন বাঁদর হয়তো খাঁচা থেকে বেরিয়ে এইসব বাঁদরামি করছে।'

রামু তার কাজে চলে গেলে দ্বৈপায়ন বলে, 'চিঠিটা সম্বন্ধে তোমার কি মনে হয় ?'

'বুঝতে পারছ না ? তোমার মনে আছে বাক্সর ঢাকনায় স্ক্রু না লাগিয়েই আমরা ওটা ড্রয়ারে চাবি বন্ধ করে রেখেছিলাম। ওই ড্রয়ারে পুরনো কিছু কাগজ আর নিশ্চয় একটা পেন্সিল ছিল। হাতটা আলগা ঢাক্না সরিয়ে বাক্স থেকে বেরিয়ে আসে, তারপর এক টুকরো কাগজে আমার হাতের লেখা নকল করে চিঠিটা লিখে দেরাজের চুল-চেরা ফাঁক দিয়ে বাইরে ফেলে দেয়। রামু ঘর পরিষ্কার করতে এসে মেঝের ওপর কাগজটা কুড়িয়ে পায়।'

'কিন্তু হাতটা নিশ্চয় লিখতে পারে না ?'

'পারে না ! তুমি দেখো নি, আমি ওটাকে লিখতে দেখেছি।'

শশিশেখরের অজ্ঞাতে তাঁর ডান হাতের যন্ত্রের মত লিখে যাওয়ার ব্যাপারটা সে বিশদভাবে বর্ণনা করে।

'একটা ব্যাপার তাহলে পরিষ্কার হল। অ্যাটর্ণি মিঃ চৌধুরীকে লেখা সেই চিঠিটা, যেটায় তোমার কাকা তাঁর ডান হাতটা তোমাকে দানপত্র করে গিয়েছিলেন, আসলে এই শয়তান হাতটারই লেখা, তোমার কাকা কিছুই জানতেন না।'

'আমার কাকার হাত যদি না হয়, তবে কার হাত ?'

'এখন আমার মনে হচ্ছে, কোন বিদেহী আত্মা তোমার কাকার জীবিত কালে তাঁর ওপর ভর করেছিল। তাঁর ডান হাতকে মৃত্যুর পর ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করাই ছিল ওটার উদ্দেশ্য। সেই আত্মা ওই হাতের ওপর ভর করে আত্মনির্ভর হয়ে উঠেছে।'

'এখন আমাদের কি কর্তব্য ?'

'আমাদের চোখ-কান খোলা রাখতে হবে, যাতে সুযোগ পেলেই ওটাকে আবার বন্দী করা যায়। যদি বন্দী নাও করতে পারি তাতেও ক্ষতি নেই। ওটা রক্ত-মাংসের হাত, চিরকাল বেঁচে থাকতে পারে না।'

অসমঞ্জর মুখ দেখে সে খুব একটা আশ্বস্ত হয়েছে বলে মনে হল না। দিন দুই নিরুপদ্রবে কেটে গেল। তৃতীয় দিন সকালে দ্বৈপায়ন ওটাকে

আবার দেখতে পেল। ওপরে ওঠবার সিঁড়ি যেখানে বাঁক নিয়েছে, সেই একতলা ও দোতালায় মাঝামাঝি রেলিং-এর পোস্টের ওপর ওটা যেন বিশ্রাম করছে। আচমকা ওখানে ওটাকে দেখে দ্বৈপায়ন প্রথমে হক্‌চকিয়ে গেল। দ্বিধা কাটিয়ে সে এক লাফ মেরে এগুতেই হাতটা ঢালু রেলিংয়ের ওপর দিয়ে বিছের মত দ্রুতগতিতে ওপর দিকে উঠতে লাগল, তারপর একসময় দ্বৈপায়নের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল।

দিন তিনেক পর অসমঞ্জ লাইব্রেরীতে বসে গবেষণার কিছু একটা লিখছিল। রাত তখন প্রায় সাড়ে আটটা। হঠাৎ তার নজরে পড়ল ঘরের অপর প্রান্তে মেঝের ওপর একটা বই খোলা আর হাতটাও সেখানে। অসমঞ্জ অবাক হয়ে দেখল, কোন বই গভীর মনযোগ দিয়ে প্রতিটি লাইন পড়তে গেলে মানুষ যেমন একটা আঙুল পাতার ওপর রেখে পড়ে, হাতের তর্জনীটাও তেমনভাবে নড়ছে।

অসমঞ্জ চেয়ার ঠেলে উঠতেই হাতটা সচকিতভাবে বইটা ছেড়ে তড়্‌তড়্‌ করে একটা আলমারি বেয়ে ওপরে উঠে গেল। তারপর অসমঞ্জর নাগালের বাইরে গিয়ে আঙুলগুলো মুঠ করে শুধু বুড়ো আঙুলটা নাচাতে লাগল, যেন তাকে কলা দেখাচ্ছে। অসমঞ্জ মই বেয়ে ওপরে উঠবে কিনা ভাবছে, হাতটা বোধহয় তার মনের ভাব অনুমান করেই বইয়ের পেছনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দিন কয়েক কেটে গেছে, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য আর কিছু ঘটে নি। পঞ্চমী নামে অসমঞ্জর একটা পোষা কাকাতুয়া ছিল। মাঝে মাঝে খাঁচার ভেতর দিয়ে পা বের করে পাখীটা অদ্ভুত কৌশলে খাঁচার দরজা খুলে বেরিয়ে আসত। তু-চার দিন এ-ঘর ও-ঘর করার পর ধরা দিত, কিন্তু পালিয়ে যাবার চেষ্টা করত না। অসমঞ্জ সেদিন সন্ধ্যেবেলা লাইব্রেরীতে কাজ করছে, এমন সময় পাখীটা ঘরে ঢুকে কয়েকবার চক্কর দিল, তারপর একটা কড়িকাঠে বসে ঘাড় বেঁকিয়ে

অসমঞ্জকে দেখতে লাগল। অসমঞ্জ তার স্বভাব জানে। তাই সে নিজের কাজ করে চলল, হঠাৎ কাকাতুয়াটি বলে উঠল—

'অসমঞ্জ, এই অসমঞ্জ !"

অসমঞ্জ একটু মুচকি হাসল।

'বদমাস, তোকে খুন্ করব,' পাখীটা বলে উঠল।

অসমঞ্জ একটু বিরক্তভাবে ওপর দিকে তাকাল আর সঙ্গে সঙ্গে সে চমকে উঠল। হাতটা কড়িকাঠ বেয়ে কাকাতুয়ার দিকে এগুচ্ছে। একটা অজানা আশঙ্কায় সে শিউরে উঠল। হাতটার চলার ভঙ্গি কি বিচ্ছিরি আর কি দ্রুতগতি! অসমঞ্জ কিছু করার আগেই ওটা কাকাতুয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাঁচ আঙুল দিয়ে পাখীটার গলা টিপে ধরল। সে এক বীভৎস দৃশ্য! পাখীটাও অতর্কিতে এমনভাবে আক্রান্ত হয়ে ক্যাঁ-ক্যাঁ করে ডেকে উঠল, তারপর নিজেকে মুক্ত করার জন্য ধারালো নখ দিয়ে ওটাকে আঁচড়াতে লাগল। ওই অবস্থায় ঝট্‌পট্ করতে করতে কাকাতুয়াটা ঘরের চারিদিকে কয়েকবার চক্কর দিল। কিন্তু কণ্ঠলগ্ন হাতের ভার সইতে না পেরে একসময় ধপ্ করে মাটিতে পড়ে গেল। মাটিতে পড়েও দু'জনের মধ্যে যেন ধস্তাধস্তি হুটোপুটি চলতে লাগল। তারপর একসময় পাখীর চোখের মণিদুটো কয়েক বার ঘুরে শাদা অংশ বেরিয়ে এল, গলা দিয়ে অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়েই থেমে গেল। পাখীটা ঢলে পড়ল। হাতের আঙুলগুলো পাখীর গলা ছেড়ে দেবার আগেই অসমঞ্জ একটা ক্রুদ্ধ আবেগে লাফিয়ে পড়ে হাতটাকে প্রাণপণ শক্তিতে চেপে ধরল। তারপর চেঁচিয়ে দ্বৈপায়নের নাম ধরে ডাকতে লাগল।

দ্বৈপায়ন ছুটে আসতেই অসমঞ্জ উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'শয়তানটাকে পাকড়াও করেছি। দেখ, আমার পঞ্চমীকে গলা টিপে মেরে ফেলেছে।'

দ্বৈপায়ন এক নজরে সমস্ত ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করে নিল, তারপর

বলল, 'আমি কাঠের বাক্সটা নিয়ে আসছি, তুমি ওটাকে ধরে রাখতে পারবে তো ?'

'পারব। হাতটা বোধ হয় এতক্ষণ পঞ্চমীর সাথে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে কিছুটা কাবু হয়ে পড়েছে।'

দ্বৈপায়ন বাক্স নিয়ে ফিরে আসতেই অসমঞ্জ হাতটাকে তাড়াতাড়ি বাক্সের মধ্যে পুরে ফেলল, তারপর উন্মত্তের মত একটা বড় পেরেকের ছুঁচলো প্রান্ত নির্জীব হাতের ওপর রেখে একটা হাতুড়ি দিয়ে পেরেকের মাথায় দমাদম্ হাতুড়ি চালাতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে যেখানে পেরেকটা বিঁধছিল, সেখান থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। হাতটা যেন যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে উঠল। একটা বড় বিছেকে লোহার শলাকা দিয়ে বিঁধলে সে যেমন কুঁকড়ে উঠে শলাকাটাকে দংশন করবার চেষ্টা করে, হাতের আঙুলগুলোও তেমনি বেঁকে রুদ্ধ আক্রোশে যেন পেরেকটাকে আক্রমণ করতে চেষ্টা করছে।

'শীগ্‌গির ঢাকনাটা নিয়ে এস,' অসমঞ্জ প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে সে একটা চেয়ারের 'কুশন' দিয়ে বাক্সের ওপরটা চেপে ধরল। দ্বৈপায়ন এক ছুটে একটা ঢাকনা নিয়ে এল। স্ক্রু দিয়ে বাক্সের ঢাকনা বন্ধ করে অসমঞ্জ সেটাকে আবার দেরাজে পুরে চাবি বন্ধ করে দিল। তারপর একটা চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে হাঁপাতে লাগল। দারুণ উত্তেজনায় তার সর্বাঙ্গ কাঁপছে তখনও, চোখ মুখ লাল হয়ে গেছে। একটু আত্মস্থ হবার পর অসমঞ্জ বলল, 'ড্রয়ারটা আর খুলছি না, হাতটা ওখানেই দম বন্ধ হয়ে মরুক।'

কিছুদিন বেশ নিরুপদ্রবেই কেটে গেল। অসমঞ্জ আবার তার গবেষণায় আত্মনিয়োগ করল। তারপর হঠাৎ একদিন রাত্রে তার বাড়িতে ছোটখাটো একটা চুরি হয়ে গেল। চোর বিশেষ কিছুই নিতে পারে নি। পুলিশ ইন্সপেক্টর যিনি তদন্তে এসেছিলেন, বললেন,

'আপনার ভাগ্য ভাল মশাই, যেভাবে চোর ঘরগুলোতে হানা দিয়েছিল, তা থেকে মনে হয় লোকটা ঘুঘু। নিশ্চয় কিছু একটা বিপদের সঙ্কেত পেয়ে কাজ হাঁসিল করার আগেই সরে পড়েছে।

অসমঞ্জ তাঁর সঙ্গে একমত হল। ইন্সপেক্টর একটু দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে বললেন, 'একটা ব্যাপার আমি কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছি না। চোর যেভাবে আপনার আলমারি খুলেছিল, তা থেকে অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে, সেএকজন দাগী আসামী। কিন্তু এমন পাকা লোক এতটা কাঁচা কাজ করল!'

অসমঞ্জ একটু বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, 'কাঁচা কাজ?'

'হ্যাঁ, মানে এ ধরনের ঘুঘু চোরেরা কোনও চিহ্ন সাধারণত রেখে যায় না। কিন্তু যে লোকটা এসেছিল সে চারিদিকে তার আঙুলের ছাপ রেখে গেছে, যেন খুশীমতো ছড়িয়ে গেছে। আপনার লাইব্রেরি ঘরের দরজা জানলায় নতুন রঙ করিয়েছেন, সেই কাঁচা রঙের ওপর আঙুলের ছাপ স্পষ্ট হয়ে ফুটেছে। তা ছাড়া একতলার প্রায় সব ঘরে একই হাতের আঙুলের ছাপ পেয়েছি। ব্যাপারটা আমার কাছে একটু আশ্চর্য ঠেকছে।'

অসমঞ্জ হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'বাঁ হাত না ডান হাত?'

'ডান হাত সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। আমার মনে হয় লোকটার বোধহয় একটু মাথা খারাপ আছে। তা না হলে এই চিরকুটটা লিখবে কেন?' পকেট থেকে একটা ছোট্ট কাগজের টুকরো বের করতে করতে তিনি বললেন, 'এটা সিঁড়ির মুখে কুড়িয়ে পেয়েছি। লেখা আছে, 'আমি চললাম, অসমঞ্জ! তবে শীগ্‌গিরই ফিরে আসব।' আপনি কি হাতের লেখাটা চেনেন?'

অসমঞ্জ বিমূঢ়ের মত মাথা নাড়ল! কিন্তু একটা সন্দেহ তার মনে দোলা দিতে লাগল। সে পায়ে পায়ে এগিয়ে তার সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ডানদিকের দেরাজগুলো খুলে ফেলল। যে আশঙ্কা সে

করেছিল তা-ই সত্যি। কাঠের বাক্সর ঢাকনাটা খোলা অবস্থায় পড়ে আছে, আর বাক্সের ভেতরটা শূন্য। কিন্তু হাতটা বেরুলো কি ভাবে! চোর কি তবে দেরাজ খুলে কাঠের বাক্সে কি আছে দেখবার জন্য স্ক্রু আলগা করে ঢাক্না খুলেছিল আর সেই ফাঁকে হাতটা বেরিয়ে গেছে। এই ভৌতিক কাণ্ড দেখেই হয়ত চোরটা চুরি মাথায় রেখে চম্পট দিয়েছে। চারদিকে যে আঙুলের ছাপের কথা ইন্সপেক্টার বলল তা নিশ্চয় চোরের নয়, ছাপগুলো ওই হাতটার। কি সাঙ্ঘাতিক!

সেদিনই সে মনস্থির করে ফেলল, এ বাড়ি ছেড়ে বেশ কয়েক মাস সে বাইরে থাকবে। এখানে তার কাজ একটুও এগুচ্ছে না। বলতে গেলে কাকার মৃত্যুর পর থেকে সে কিছুই করে নি। দ্বৈপায়নকে সে তার সিদ্ধান্তের কথা জানালো। সেও তাতে উৎসাহ দিল। কারণ এই হাতের ব্যাপারে তার মত সাহসী লোকও বেশ ঘাবড়ে গেছে। তাছাড়া অসমঞ্জর ওপর তার অগাধ বিশ্বাস, তার গবেষণার ওপর তার গভীর আগ্রহ, সুতরাং বাইরে গিয়ে যদি অসমঞ্জ আবার পুরোদ্যমে গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে, তবে সেও খুশি হবে।

মধুপুরে অসমঞ্জর বাবা শখ করে একটা বাড়ি কিনেছিলেন। ছুটি-ছাটায় বেড়াতে যাবেন এই ছিল তাঁর বাসনা। বাড়িটা বাংলো ধরনের, একতলা। বাড়িটা আগে এক সাহেবের ছিল। একটা বসবার ঘর, দু'টো শোবার ঘর, খাবার ঘর, আর বাথরুম, এই নিয়ে বাংলোটা বেশ অনেকটা জায়গার ওপর। সাহেব তাঁর নিজের দেশের মত বাংলোটাকে বানিয়েছিলেন। শোবার ঘরের সংলগ্ন স্নানের ঘর। প্রত্যেক ঘরে শীতে আগুন পোহাবার জন্য 'ফায়ার প্লেস' বা তাপ চুল্লীরও ব্যবস্থা ছিল। তবে বিজলী বাতি নেই, হ্যাজাক আর হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বালিয়েই কাজ চালাতে হয়।

অসমঞ্জর গাড়িতেই ওরা মধুপুর গেল। ওরা যখন পেঁছিল তখন

রাত হয়ে গেছে। রামু বড় টিফিন ক্যারিয়ার ভরে খাবার দিয়ে দিয়েছিল। মালি তাড়াতাড়ি সেগুলো গরম করে দিল। খাওয়া-দাওয়া সেরে ওরা শোবার ঘরে গেল। দু'টো শোবার ঘর পাশাপাশি,মাঝখানে একটা দরজা দিয়ে দু-ঘরের মধ্যে যাতায়াতের ব্যবস্থা আছে। মালি এসে বিছানা ঝেড়ে-ঝুড়ে পেতে দিল। দু'জনে দু'ঘরে শোবে। অসমঞ্জ তার নির্দিষ্ট শোবার ঘরে এসে জামা কাপড় ছাড়তে ছাড়তে পাশের ঘরে দ্বৈপায়নকে উদ্দেশ করে বলল, 'রামুর কাণ্ডটা দেখেছ? এখানে খুব শীতে আমার গাড়ি চালাতে কষ্ট হবে ভেবে চামড়ার কনুই পর্যন্ত বড় দস্তানাটা দিয়েছে, তাও আবার দিয়েছে একটা।'

তারপরই দ্বৈপায়ন অসমঞ্জর ভয়ার্ত চীৎকারে চমকে উঠল।

'দ্বৈপায়ন, শীগগির, হাতটা এই দস্তানার মধ্যে লুকিয়ে আছে!'

তারপরই একটা কিছু সজোরে ছুঁড়ে ফেলার শব্দ। দ্বৈপায়ন পড়ি-মরি করে ছুটে এসে দেখল, অসমঞ্জ বেতস্ পাতার মত কাঁপছে। দ্বৈপায়নকে দেখে সে বলে উঠল, 'আমি ওটাকে স্নানের ঘরে ছুঁড়ে দিয়েছি। দেয়ালে বাড়ি খেয়ে চৌবাচ্চায় জলের মধ্যে পড়েছে।'

দ্বৈপায়ন লণ্ঠন হাতে নিয়ে স্নানের ঘরে উঁকি দিল। হ্যাঁ, হাতটা চৌবাচ্চার মধ্যেই পড়েছে। অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকার ফলে চৌবাচ্চাটার চারপাশে শ্যাওলা পড়ে গেছে। হাতটা চৌবাচ্চার গা বেয়ে উঠতে চেষ্টা করছে আর পিছলে পড়ছে। হাতের তালুর উল্টোদিকে একটা গর্ত দ্বৈপায়নের নজরে পড়ল। অসমঞ্জ যে পেরেক ফুটিয়েছিল তারই গর্ত। হাতটা যেন হামা দিয়ে উঠতে চেষ্টা করছে, কিন্তু কিছুটা উঠেই অসহায়ের মত পিছলে পড়ে যাচ্ছে।

'তুমি ওটার ওপর নজর রাখ, আমি একটা বাক্স-টাক্স কিছু নিয়ে আসছি।' দ্বৈপায়ন প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল। পাশের ঘর থেকে সে অসমঞ্জর চীৎকার শুনতে পেল, 'দ্বৈপায়ন, জলদি! শয়তানটা উঠে পড়েছে! না শয়তান, তোকে পালাতে দেব না। দ্বৈপায়ন কোথায়

গেলে, আমি ধরে রাখতে পারছি না, পিছলে যাচ্ছে। আমাকে নখ দিয়ে আঁচড়াচ্ছে। জানালাটা খোলা আছে, শীগ্‌গির বন্ধ কর। আঃ, বেরিয়ে গেল।'

দ্বৈপায়ন ছুটে এল আর তৎক্ষণাৎ খোলা জানালা দিয়ে বাইরে জমির ওপর ধপ্‌ করে কিছু একটা পড়ার শব্দ হল। লণ্ঠন নিয়ে ওরা বাইরে অনেক খোঁজাখুঁজি করল কিন্তু হাতটাকে আর দেখা গেল না।

এরপরই অসমঞ্জ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ল। ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে বললেন যে, মানসিক আঘাত থেকেই অসুখটা হয়েছে। 'এ কেস অফ্‌ নার্ভস ব্রেকডাউন ডিউ টু সাম গ্রেট ইমোশ্যনাল শক্‌।' তিনি রোগীর পরিচর্যার জন্য একজন অভিজ্ঞ নার্সের কথা বললেন। একটা সতর্কবাণীও তিনি করলেন, 'রোগীর ঘরে সারারাত যেন আলো জ্বলে, অন্ধকারে একা তাকে কোনমতেই যেন রাখা না হয়।'

অসমঞ্জ কিন্তু নার্স রাখার প্রস্তাবে সম্মত হল না, বলল, দ্বৈপায়নকেই সব সময় তার কাছে থাকতে হবে। বাইরের লোক রাখলেই হাতটা তাকে কায়দা করে আবার ঘরে ঢুকে পড়বে। দ্বৈপায়ন তাকে অভয় দিয়ে বলল, 'ওসব কথা তুমি আর চিন্তা কোর না। হাতটাকে এবার দেখে মনে হল যেন অনেক নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। তুমি ওটাকে দেয়ালে ছুঁড়ে মারাতে ওটা আরও ঘায়েল হয়েছে। এভাবে বেশীদিন আর ওটা টিঁকে থাকতে পারবে না, ওর আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। তুমি একটু ভাল হলেই আমরা এখান থেকে চলে যাব। বাক্স-বিছানা কিছুই সঙ্গে নেব না, এক জামা-কাপড়ে বেরিয়ে পড়ব। হাতটা কোনো কিছুর মধ্যে লুকিয়ে আর আমাদের সঙ্গ নিতে পারবে না। আমরা কাউকে আমাদের ঠিকানা জানাব না, কোন পার্সেল এলে ফেরৎ দিয়ে দেব। ব্যাটার চোখে আমরা এবার এমন ধূলো দেব··· !'

দ্বৈপায়নের প্রস্তাব অসমঞ্জর খুব মনে ধরল। কয়েক দিনের মধ্যেই সে হেঁটে চলে বেড়াতে পারবে। কিন্তু কেন তাকে এভাবে পালিয়ে

বেড়াতে হবে? দ্বৈপায়নকে অনেকটা অনুযোগের কণ্ঠে সে বলল, 'আমি কি করেছি বলতে পার? কি আমার অপরাধ? কেন এই হাত-পিশাচটা রাক্ষুসে আঙুল নিয়ে আমাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে?'

দ্বৈপায়ন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'ঠিক তা নয়। প্রথম যখন হাতটাকে আমরা ধরেছিলাম, তখন ওটার ঘৃণাই বল কি বিরাগই বল, সকলের বিরুদ্ধে যেন মুখিয়ে ছিল। কাকাতুয়াটাকে অকারণে কেমন নৃশংসভাবে গলা টিপে মারল, মনে নেই? তুমি পেরেক দিয়ে ওর গায়ে ফুটো করার পর থেকে ওটা তোমার ওপর ক্ষেপেছে মনে হয়। দেরাজে বেশ কিছুদিন বন্দী থাকার সময় প্রতিহিংসার চিন্তাটা বোধহয় ওর মনে আসে।'

অসমঞ্জ দ্রুত আরোগ্যলাভ করতে লাগল। দ্বৈপায়ন সব সময় তার ঘরে পাহারা থাকে, চারদিকে সতর্ক দৃষ্টিও সে রেখেছিল। পয়লা জানুয়ারী তারা মধুপুর ছাড়বে, কোথায় যাবে তা গাড়িতেই ঠিক করা হবে।

একত্রিশে ডিসেম্বর এল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। অসমঞ্জর ঘরের দরজা-জানালা সব সময় বন্ধ থাকে। একদিন মালি ঘরে আলো বাতাস ঢুকবে বলে একটা জানালা খুলতেই প্রচণ্ড ধমক খেয়েছিল।

সন্ধ্যেবেলা অসমঞ্জ আর দ্বৈপায়ন দাবা নিয়ে বসল। খেলায় তারা তন্ময় হয়ে গেছে, এমন সময় মালি একটা চিঠি নিয়ে এল। বিকেলের ডাকে এসেছে। দ্বৈপায়নই সাধারণতঃ অসমঞ্জর চিঠিপত্রের জবাব দেয়, একান্ত ব্যক্তিগত চিঠি ছাড়া।

চিঠিটা সে মালির হাত থেকে নিয়ে খুলল। খুবই সংক্ষিপ্ত চিঠি, কোনও ঠিকানা বা স্বাক্ষর নেই।

"আজ রাত দশটায় আমাদের শেষ সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত থেকো।'

'কার চিঠি?' অসমঞ্জ প্রশ্ন করে।

'আমার চিঠি', বুক পকেটে চিঠিটা রাখতে রাখতে দ্বৈপায়ন উত্তর

দেয়। ইচ্ছে করেই সে মিথ্যে কথা বলল। অসমঞ্জর বর্তমান শারীরিক মানসিক অবস্থার পক্ষে চিঠির বক্তব্য মোটেই সুখকর হবে না। সে ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। না, সব বন্ধ আছে।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে দু'জনে আবার দাবায় বসল। অসমঞ্জর অসুখ হবার পর থেকে মালি এই শোবার ঘরেই দু'জনের খাবার দিচ্ছিল। ঘরের মধ্যে ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছে। ঘরটা বেশ গরম হয়ে উঠেছে। কনকনে শীতের পক্ষে আরামদায়ক। রাত দশটা বাজল, সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ দরজার মৃদু করাঘাত শোনা গেল।

'কে?' অসমঞ্জ একটু চেঁচিয়েই জিজ্ঞেস করে।

কোন উত্তর নেই।

'মালি!' অসমঞ্জ আবার গলা হাঁকে।

এবারও কোন সাড়া নেই।

'নিশ্চয়ই সেই হাতটা,' অসমঞ্জ দরজায় লাগানো ছিটকিনির দিকে তাকিয়ে বলে।

দ্বৈপায়ন এবার উঠে দুটো ঘরেরই দরজা জানালা সব দেখে আসে। 'না, সব ছিটকিনি দেওয়া আছে।' সে আবার দাবায় বসে। জানালার কাচের শার্সির ওপর কি একটা শব্দ হল।

'কিসের শব্দ?' অসমঞ্জ বলে ওঠে।

'ও কিছু না, বাতাসে যুঁই গাছের ঝাড়টা বোধহয় জানালায় ধাক্কা মারছে।'

'না-না, কেউ যেন ঠক্‌ঠক্ করছে।' অসমঞ্জ উঠে যে জানালা থেকে শব্দ আসছিল তার পর্দাটা সরিয়ে ফেলল। তারপরই সে দু-পা পিছিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'দেখ, দেখ, হাতটা কেমন করে ঝুলছে! ওটার হাতে কি?'

দ্বৈপায়ন ততক্ষণে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সে বলল, 'একটা ছুরি। দেখ, কেমন করে ছুরির ফলাটা জানালার দুই কপাট যেখানে

মিশেছে তার ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে ছিটকিনি খুলবার চেষ্টা করছে।

হঠাৎ অসমঞ্জ বলল, 'এবার তোমার চাল দ্বৈপায়ন, ঘোড়া সামলাও।'

দ্বৈপায়নকে কিন্তু তার ঘোড়া নিয়ে চিন্তিত বলে মনে হল না। সে ভাবছে অসমঞ্জ হঠাৎ এত সাহস পেল কোথা থেকে! অসমঞ্জই আবার কথা বলল, 'কি হল, একটা চাল দিতে তুমি রাত কাবার করে দেবে নাকি?'

তুমি দেখছি সমস্ত ব্যাপারটা বেশ ঠাণ্ডা মাথায় নিয়েছ। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, ভয়ে আমার হাত-পা যেন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।'

'ভয় করবার কিছু নেই, দ্বৈপায়ন। ভাল করে চিন্তা করে দেখ, হাতটা অশরীরি কিছু নয়। জীবন্ত প্রাণীর মতই ওটাকে পৃথিবীর টাইম আর স্পেসের নিয়মগুলো মেনে চলতে হচ্ছে। এমন নয় যে ওটা শূন্যে মিলিয়ে যেতে পারে কিংবা বন্ধ দরজার ভেতর দিয়ে যাতায়াত করতে পারে। সুতরাং এই ঘরে ঢোকবার কোনও ছিদ্রপথ না পেয়ে ওটাকে হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হবে। আমি ভয়ের শেষ সীমানায় পৌঁছে ভয়কে জয় করতে শিখেছি। আজ রাতটা কোনমতে কাটিয়ে কাল সকালে ওটাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ব।'

হঠাৎ দ্বৈপায়ন বলে উঠল, 'সর্বনাশ! আমার বাথরুমের জানালাটা বোধহয় খোলা আছে।'

'শীগগির,' অসমঞ্জ দ্বৈপায়নকে এক ঠেলা মেরে বলল, 'ছুটে গিয়ে জানালাটা বন্ধ করে এস।'

দ্বৈপায়ন ছুটে গেল। তার ঘরে লণ্ঠন ছিল না, ঘরটা অন্ধকার। ছুটতে ছুটতে গিয়ে দরজার চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে সে পড়ে গেল। মনে মনে একটা গালাগালি দিয়ে সে অসমঞ্জর ঘরে ফিরে এসে লণ্ঠনটা নিয়ে আবার ছুটল।

বাথরুমের ছোট জানালাটা সত্যিই খোলা, ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকছে।

জানালা বন্ধ করে সে আবার অসমঞ্জর ঘরের দিকে এগুলো। নিজের ঘর পেরিয়ে দ্বিতীয় ঘরে পা বাড়াতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো দ্বৈপায়ন।

ফায়ার প্লেসে ধিক্ ধিক্ জ্বলা আগুনে ঘরটা আবছা আলো আবছা অন্ধকার। সেই স্তিমিত আলোয় দ্বৈপায়ন স্তম্ভিত হয়ে দেখল, হাতটা মাটির ওপর বুকে হেঁটে অসমঞ্জর দিকে এগুচ্ছে, আঙুলের মধ্যে শক্ত করে ছুরিটা ধরা, শুধু বুড়ো আঙুল খোলা। বুড়ো আঙুলে ভর দিয়েই হাতটা এগুচ্ছে মনে হয়, তাই আস্তেআস্তে বেশ কষ্ট করে ওটাকে নড়াচড়া করতে হচ্ছে। দ্বৈপায়ন আতঙ্কে ওটার দিকে তাকিয়ে আছে, তার সমস্ত বিচার-বুদ্ধি সে যেন হারিয়ে ফেলেছে। দ্বৈপায়নের চোখের সামনে যেন একটা ছবি ভেসে উঠল। হাতটা অসমঞ্জর কাছে গিয়ে তার পা ও কোমর বেয়ে ওপরে উঠছে, তারপর বুকের কাছে গিয়ে···

মাথাটা ঘুরে উঠতেই দ্বৈপায়নের যেন চমক ভাঙল। আর কিছু চিন্তা না করেই সে হাতের লণ্ঠনটা সজোরে সেই শয়তানটাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল। ঝন্ ঝন্ করে লণ্ঠনের কাঁচ ভেঙে গেল। লণ্ঠনটা সোজা গিয়ে হাতে লেগেছে। হাতটা তখন মেঝেয় বিছানো একটা মাঝারি আকারের কার্পেটের ওপর দিয়ে এগুচ্ছিল। লণ্ঠনের কাঁচ ভেঙে যেতেই কার্পেটে আগুন ধরে গেল। দেখতে দেখতে আগুন ছড়িয়ে পড়ল কার্পেটে। দ্বৈপায়ন এক ছুটে অসমঞ্জকে টান মেরে আগুনের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে এল। হাতটা সেই আগুনের মধ্যে পড়ে ছট্‌ফট্ করছে। আগুনের গ্রাস থেকে বেরিয়ে আসার কি নিস্ফল চেষ্টা! চারিদিকের আগুন ওটাকে যেন ঘিরে ধরেছে। ওদের চোখের সামনে হাতটা পুড়ে কালো হয়ে যাচ্ছে, কয়লার মত কালো —কুঁকড়ে যাচ্ছে হাতটা—সে এক বীভৎস দৃশ্য!

অসমঞ্জও বিস্ফারিত চোখে দৃশ্যটা দেখছিল, হঠাৎ সে জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ল। দ্বৈপায়ন তাকে টেনে নিয়ে ঘরের দরজা খুলে বাইরে এসে মালিকে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল। মালি যখন ছুটে এল, তখন

ঘরে রীতিমত বহ্ন্যুৎসব শুরু হয়ে গেছে। ধোঁয়ায় চারিদিকে অন্ধকার।

আগুন যখন নেভানো হল ততক্ষণে কার্পেট পুড়ে ছাই, বিছানাও আধ পোড়া। সেই অভিশপ্ত হাতের কোনও চিহ্ন কিন্তু আর কোথাও পাওয়া গেল না। ওটা যে পুড়ে খাক্ হয়ে গেছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ দু'জনের কারও মনে ছিল না।

জীবন্ত পাঁচ আঙুলের পিশাচ্ হাতটাকে আর কখনোও দেখা যায় নি।*

---

*বিদেশী ছায়ায়

বিলাপী আত্মা

ফাঁসীর আগে আসামী ম্যাথুসের স্বাস্থ্য ডাঃ পিল্লাই বার দুই পরীক্ষা করেছিলেন। ঘটনাটি ঘটেছিল কেরালায়, ডাঃ পিল্লাই হলেন জেলের ডাক্তার। ওঁরা দু'জনই ক্রীশ্চান।

জীবনের আশা আর নেই জেনে ম্যাথুস ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছিল। প্রতিটি রাতের পর প্রসন্ন সকাল যে তার জীবনের মেয়াদ ক্রমেই কমিয়ে আনছে তা জেনেও সে তেমন আতঙ্কিত হচ্ছিল না, মৃত্যুভয় যেন সে জয় করে ফেলেছে। তার জীবনের আবেদন সরকার নাকচ করে দিয়েছেন;জানবার পর থেকেই তার এই পরিবর্তনের শুরু। তার আগে পর্যন্ত, অর্থাৎ বাঁচার ক্ষীণতর আশাও তার মনে যতক্ষণ ছিল, ততক্ষণ লোকটি দিবারাত্রের প্রতিটি ঘণ্টা মৃত্যুর অজানা বিভীষিকায় উন্মাদের মত আচরণ করেছে। ডাঃ পিল্লাই একজনমানুষের মধ্যে বাঁচার এমন তীব্র আকাঙ্ক্ষা আর শেষ আশাটুকু নির্মূল হয়ে যাবার পর সেই লোকটিরই জীবন সম্বন্ধে নিরাসক্তি আর পরস্পর-বিরোধী মনোভাবে বিস্মিত না হয়ে পারেন নি। পরিবর্তনটা এত আকস্মিক যে ডাক্তারের মনে হয়েছিল আসামীর আবেদন না-মঞ্জুর খবরটাই তার অনুভূতির সমস্ত ইন্দ্রিয়কে বিকল করে দিয়েছে। খবরটা শোনার পরই সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

সেই প্রথমবার ডাঃ পিল্লাই তার চিকিৎসা করেন। জ্ঞান হবার পর থেকেই তার এই অদ্ভুত পরিবর্তন।

যে অপরাধ সে করেছিল তার কোনো ক্ষমা নেই। জনসাধারণের

মনেও ম্যাথুসের প্রতি বিন্দুমাত্র করুণার সৃষ্টি হয়নি। ত্রিবেন্দ্রামে তার একটা ছোট মনোহারী দোকান ছিল। নিজের মা আর বউ নিয়ে ছিল তার সংসার। সেই মা-ই হয়েছিলেন তার জঘন্যতম অপরাধের শিকার। বিধবা মায়ের হাজার পাঁচেক টাকা ছিল। সেই শেষ সম্বলটুকুর ওপর ম্যাথুসের লোভই এই অপরাধের মূল কারণ।

বিচারের সময় প্রকাশ হয়ে পড়ে, ওই ঘটনার সময় বাজারে তার হাজার খানেক টাকা দেনা ছিল। তার বউ দিন কয়েকের জন্য ত্রিচুরে বোনের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিল, আর সেই সুযোগে এক রাত্রে মাকে গলা টিপে হত্যা করে বাড়ির পেছনে ছোট বাগানের জমিতে মৃতদেহ সে কবর দিয়েছিল। বেশ কিছুদিন ধরেই মায়ের সঙ্গে টাকা-পয়সার ব্যাপার নিয়ে তার খিটিমিটি লেগেই ছিল। মা প্রায়ই বলতেন বাড়ি ছেড়ে তিনি চলে যাবেন। ঘটনার দিনেও মা আর ছেলের মধ্যে তুমুল ঝগড়া হয়, যার ফলে ভদ্রমহিলা ব্যাঙ্ক থেকে সব টাকা তুলে আনেন। পরের দিন ভোরে তিনি তাঁর বাক্স-পাঁটরা নিয়ে যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাবেন বলেছিলেন। পাড়া-পড়শি এ ঘটনার সাক্ষী ছিল। সেই রাতেই ম্যাথুস কাজ হাঁসিল করে।

খুব ঠাণ্ডা মাথায়, ভেবে চিন্তে, সে তার পরবর্তী কাজগুলো করেছিল। মায়ের জিনিসপত্র একটা তোরঙ্গে পুরে রাত থাকতেই সে বেরিয়ে পড়ে। স্টেশনে গিয়ে মাদ্রাজগামী একটা গাড়িতে তোরঙ্গটা বসবার আসনের তলায় রেখে সে ফিরে এসেছিল। একটু বেলা হতেই পাড়া-পড়শির কাছে সে রটিয়ে দিয়েছিল মা তার সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি থেকে চলে গেছে, কোথায় গেছে তা সে জানে না। মার সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা কারু অজানা ছিল না, তাই মিথ্যে দুঃখিত হবার ভান না করে খোলাখুলিই সে বলেছিল, মা-ই ছিল যত অশান্তির মূলে, এবার বাড়িতে শান্তি ফিরে আসবে।

বউ ফিরে আসার পর তাকেও সে একই কথা বলেছিল। মা যে

কোন ঠিকানা দিয়ে যায়নি তা জানাতেও সে ভোলেনি, কারণ তার বউ ভাল মানুষ, যদি মাকে ফিরে আসার জন্য চিঠি লেখে তাই বাজে ঠিকানা দিয়ে হাঙ্গামায় পড়তে চায়নি। বউ তার কথা সরল বিশ্বাসেই মেনে নিয়েছিল, অবিশ্বাস কিংবা সন্দেহ করার কারণ অবশ্য ছিল না।

ঘটনার পর কিছুদিন সে খুবই সতর্ক ছিল। প্রতিটি অপরাধীর ক্ষেত্রে দেখা গেছে একটা নির্দিষ্ট সময় বা সীমা পর্যন্ত তারা হুঁশিয়ার থাকে, কিন্তু তারপরেই তারা ঢিলে দেয়, আর তখনই এমন মারাত্মক ভুল করে বসে যা তাদের জীবনে কাল হয়ে দাঁড়ায়। ম্যাথুসও প্রথম



প্রথম খুব ভেবে চিন্তে কাজ করতে লাগল। তার দেনা সে তখুনি শোধ করল না বরং মা যে ঘরে থাকত সেই ঘরে সে একজন ভাড়াটে বসাল, আর দোকানে যে ছোকরা তার সহকারী ছিল তাকে সে বিদেয় করল। অর্থাৎ দোকানের খরচা কমিয়ে আর বাড়িতে ভাড়াটে বসিয়ে

সে তার অবস্থা ফেরাবার চেষ্টা করছে ঐ ধারণাটাই সে পাঁচজনের মনে ঢোকাতে চাইছিল।

একমাস পরে ওই পাঁচ হাজার টাকা থেকে একশ' টাকা দিয়ে সে ব্যাঙ্কে নিজের নামে টাকা জমা দিল। তার কিছুদিন পরই হাজার টাকা দেনা শোধ করল।

এরপরই সে অসাবধান হতে লাগল। অন্য একটা ব্যাঙ্কে দু' হাজার টাকার আরও একটা অ্যাকাউনট খুলে বসল। মাকে বাগানের যে জায়গায় কবর দিয়েছিল তার গর্তটা গভীর করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই শুধু ও জায়গায়টায় বেশ কিছু মাটি আর সার ফেলে কয়েকটা গোলাপের চারা লাগিয়ে সে নিশ্চিন্ত বোধ করছিল। এটা কিন্তু তার চালে একটা মস্ত ভুলই বলতে হবে, কারণ বাগানের নেশা তার কোন কালেই ছিল না, বরং তার মাই ওই বাগানের জমিতে কিছু শাক-সবজির বাগান করেছিলেন। হঠাৎ তার এই রুচির পরিবর্তনে শুধু পাড়া-পড়শীরাই নয়, তার বউ পর্যন্ত অবাক না হয়ে পারেনি।

তোরঙ্গটা সে মাদ্রাজগামী গাড়িতে তুলে দিয়েছিল দুটো উদ্দেশ্য নিয়ে। এক, ওটার মালিক না থাকায় কেউ হয়ত ওটা বেমালুম সরিয়ে ফেলবে ; আর দুই, যদি তা নাও হয় তবে হারানো মালপত্রের গুদামে ওটা জমা হবে এবং কোন দাবীদার না জুটলে রেল কর্তৃপক্ষ হয়ত ওটা নিলেম করে দেবে। ওটার সঙ্গে তাঁকে জড়াবার কোনো কারণই ছিল না। তোরঙ্গে জামা-কাপড়ের ভাঁজে তার মার কাছে একজনের লেখা একটা চিঠি তার দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল, আর সেটাই তার কাল হয়ে দাঁড়াল। চিঠিতে তার ঠিকানা ছিল।

তোরঙ্গটা আরও অনেক হারানো মালপত্রের সঙ্গে গুদামে সত্যিই জমা পড়েছিল এবং সাধারণতঃ এসব ক্ষেত্রে যা ঘটে থাকেতাই হয়েছিল অর্থাৎ 'আছে থাকুক' এই মনোভাব নিয়ে কর্তৃপক্ষ ওটার পেছনে অযথা সময় নষ্ট করেন নি। গোলমাল বাধল গুদামে হঠাৎ আগুন লেগে

যাওয়ায়। বেশী কিছু ক্ষতি হবার আগেই অবশ্য আগুন নিভিয়ে ফেলা হল কিন্তু কয়েকটা জিনিসের সঙ্গে তোরঙ্গটাও বেশ পুড়ে গেল আর আশ্চর্যভাবে কিন্তু মাল-পত্রের সঙ্গে রক্ষা পেল চিঠিটা। একেই বলে কপাল! যাহোক, যে সব জিনিসের ক্ষতি হয়েছে তাদের মালিককে রেল থেকে ক্ষতিপূরণের কথা জানিয়ে চিঠি লেখা হল। সামান্য ক'টা জিনিসেরই মালিকের হদিশ পাওয়া গেল। তোরঙ্গটা হ'ল তাদের মধ্যে একটা।

যথাসময়ে ম্যাথুসের মার নামে চিঠিটা এল আর পড়ল ম্যাথুসের বউয়ের হাতে। আপাতদৃষ্টিতে ওটা একটা সাধারণ গতানুগতিক চিঠি ছাড়া আর কিছু নয়, কিন্তু ওটা ম্যাথুসের মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে হাজির হল। তোরঙ্গটা কেন যে এগ্‌মোর স্টেশনে এতদিন পড়েছিল তার কোন কৈফিয়তই সে দিতে পারল না। (কলিকাতায় যেমন হাওড়া ও শেয়ালদা, মাদ্রাজেও তেমন দুটো স্টেশন, সেণ্টাল আর এগ্‌মোর)। অগত্যা তাকে বলতে হল তার মার নিশ্চয়ই কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং বাধ্য হয়েই মার সন্ধানের জন্য তাকে পুলিশের শরণাপন্ন হতে হল। এ ব্যাপারে তদন্ত করতে গিয়ে পুলিসের সন্দেহ পড়ল তার ওপর। হঠাৎ কিছু অচেনা মুখকে তার বাড়ির আনাচে কানাচে উঁকি-ঝুঁকি মারতে দেখা গেল। ব্যাঙ্কে খোঁজ করতে গিয়ে তার টাকা জমা দেবার ব্যাপারটা গোয়েন্দা বিভাগের দৃষ্টি এড়াল না। তার বাগানের গোলাপ গাছ হঠাৎ বাইরের লোকের প্রশংসার বস্তু হয়ে দাঁড়াল। তারপরই একদিন পুলিশ ওয়ারেণ্ট এসে হাজির হল, বাগানের মাটি খুঁড়ে গলিত যে শব বেরুলো তার পরিচয়ও আর গোপন রইল না। বিচারে তার ফাঁসির হুকুম হ'ল।

এই হল সংক্ষেপ ঘটনা। বিচারের সময় সে এমন ভান করেছিল যেন সে কিছুই জানে না, সম্পূর্ণ নির্দোষ। কিন্তু পুলিশ এমন সব অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণ দাখিল করেছিল যে, তার ভনিতা ধোপে

টেঁকেনি ! এমন কি জেলের পাদ্রীর কাছেও সে তার অপরাধ কবুল করেনি। খৃষ্টান ধর্মে মৃত্যু-পথযাত্রীদের কনফেশানের অর্থাৎ স্বীকারোক্তির যে রীতি আছে, সেই সূত্রেই পাদ্রী সাহেব তাকে কনফেশানের জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করেছিলেন, কিন্তু কোনো ফলই হয়নি। কনফেশান ছাড়া মৃত্যু হলে তাকে নরকে পচতে হবে পাদ্রীর এই সতর্কবাণীতেও কোন কাজ হয়নি।

চৈত্র মাসের এক ভোর রাতে ম্যাথুসের ফাঁসি হয়ে গেল। ডাঃ পিল্লাইকে কর্তব্যের খাতিরে বধ্যভূমিতে হাজির থাকতে হয়েছিল। মৃতদেহ মাটিতে নামানোর পর তিনি পরীক্ষা করে নিঃসন্দেহ হলেন যে মেরুদণ্ড ও ঘাড় যেখানে মিশেছে সেই হাড় ভেঙে গেছে এবং মৃত্যু ঘটেছে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

শব-ব্যবচ্ছেদের কোনো প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী পিল্লাইকে তাও করতে হল, আর ঠিক সেই মুহূর্তে একটা বিচিত্র অনুভূতিতে তাঁর সব ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠল। তাঁর মনে হল, কেউ যেন তাঁর ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। চমকে পাশ ফিরে কাউকে কিন্তু তিনি দেখতে পেলেন না। একটা অস্বস্তিতে তাঁর মন ভরে গেল। তাঁর মনে হল যার শব-ব্যবচ্ছেদ করছেন সে যেন মারা যায়নি, কিন্তু সেটা যে তাঁর মনের ভুল সে বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণই ছিল না। ফাঁসির ঘন্টাখনেক পর তিনি মর্গে দেহটা কাটা ছেঁড়া করছেন সুতরাং এবং মনের ভুল কেন যে তাঁর হল তা ঠিক তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না।

আরও একটা ঘটনা ঘটল। জেলের ওয়ার্ডারদের একজন এসে ডাঃ পিল্লাইকে জিজ্ঞেস করল, যে দড়ি দিয়ে ম্যাথুসকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল সেটা ভুল করে মৃতদেহের সঙ্গে মর্গে চলে এসেছে কিনা। ওটা নাকি কোথাওপাত্তয়াযাচ্ছে না,একেবারে উধাওহয়ে গেছে। ব্যাপারটা সত্যিই অদ্ভুত। যে দড়ি জল্লাদের হাতে মরণ খেলায় মেতে ওঠে, সেটা

কারও যে দরকার হতে পারে তা ভাবাই যায় না। পারতপক্ষে ও দড়ি সবাই সযত্নে পরিহার করে চলে, স্পর্শ করার লোভ নিশ্চয়ই কারও হয় না। যাহোক, ওটা কিন্তু সত্যিই পাওয়া গেল না!

ডাঃ পিল্লাই বিয়ে-থা করেন নি। জেলখানারকাছেই তাঁর কোয়ার্টার। বাড়ির কাজ-কর্ম,রান্না-বান্না সব কিছুর ভার তিনি ছেড়ে দিয়েছেন তাঁর কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড যোশেফের ওপর। লোকটি শুধু কাজেরই নয়, রান্নার হাতও তার চমৎকার। ডাঃ পিল্লাই যা মাইনে পান তাতে একামানুষের স্বচ্ছন্দে চলে যায়। জেলের ডাক্তারের চাকরিটা তিনি নিয়েছিলেন বিশেষ একটা কারণে। সেটা হল ডাক্তারী পড়ার সময়েই তাঁর মনের মধ্যে একটা শখ বা খেয়াল দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। সেটা হল অপরাধীদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করা। জেলের ডাক্তারের চাকরিতে এ বিষয়ে গবেষণা করার ঢালাও সুযোগের কথা ভেবেই তিনি এ পথে এসেছিলেন। দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় যে বিশ্বাস তাঁর মনে শেকড় গেঁথে বসেছিল তা হল অধিকাংশ অপরাধ বা পাপকর্ম বিশ্লেষণ করে দেখলে এটাই প্রমাণিত হবে যে, মস্তিষ্কের একটা অস্বভাবিকতা অথবা বুভূক্ষা থেকেই এদের জন্ম। যেমন চৌর্যবৃত্তি—তাঁর মতে শুধু অভাব থেকেই এ প্রবৃত্তিমানুষেরআসে না,এর সঙ্গে মস্তিষ্কেরএক ধরনের জটিল অসুখেরও যোগাযোগ আছে, নতুবা অভাবী সবাই চোর হত। আবার এমন অনেক ধরনের অপরাধ আছে যা দৈহিক প্রয়োজনের তালিকায় পড়ে না,খেয়ালের বশে মানুষ এ ধরনের অপরাধের দাস হয়ে পড়ে, অনেকটা নেশাগ্রস্তের মত। এ বিষয়ে তিনি একটি বই লিখেছেন এবং তার বিষয়বস্তু গুণীজনের কাছে যথেষ্ট সমাদরও লাভ করেছে।

তবে অপরাধের যে দিকটা তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল তা হ'লমানুষের হিংস্র হয়ে ওঠা এবং হত্যা করার দুর্দম স্পৃহা। বাড়ি ফেরার পথে, সকালে যে খুনী আসামীরশেষ সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন তার কথাই মনে মনে চিন্তা করছিলেন। জঘন্য অপরাধ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ

নেই। ম্যাথুসের টাকার প্রয়োজন এমন স্তরে এসে পৌঁছোয় নি, যার জন্য খুন করা ছাড়া তার আর উপায় ছিল না। খুনের অস্বাভাবিকতার জন্যে খুনীকে তিনি অপরাধী না ভেবে উন্মাদের পর্যায়ে ফেলাই সঙ্গত মনে করছিলেন। যতদূর জানা যায়,লোকটি শান্ত এবং অমায়িক প্রকৃতির ছিল,স্বামী হিসেবেও তার সুনাম ছিল,আর পরিচয় ছিল একজন মিশুক প্রতিবেশী হিসাবে। কিন্তু সেই লোকটিই এমন এক নৃশংস অপরাধ করে বসল, যা সে ঠাণ্ডা মাথায়ই করে থাকুক কিংবা উন্মাদনা বশতই করে থাকুক, তার জন্য সমাজ তাকে কখনও ক্ষমা করবে না। এমন ঘৃণ্য কাজ যে করে তার এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার নেই।

কিন্তু একটা কথা, ডাঃ পিল্লাই কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না। লোকটা অপরাধ স্বীকার করল না কেন? সে যে অপরাধী এ বিষয়ে সন্দেহ করার কিছুমাত্র কারণ নেই। তবু শেষ পর্যন্ত, এমন কি বধ্য-ভূমিতে যাবার মুহূর্তেও, সে কেন অপরাধ স্বীকার করে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল না তা ডাঃ পিল্লাইয়ের কাছে হেঁয়ালি বলেই মনে হল।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর তিনি তাঁর পড়বার ঘরে এসে বসলেন। ঘরটিতে আলমারি ঠাসা বই। আজ কেন যেন পড়তে তাঁর মন বসছিল না। ঘুরে ফিরেই ম্যাথুসের কথা তাঁর মনে পড়ছিল, আর মনে হচ্ছিল মর্গে সেই বিচিত্র অনুভূতির কথা। যেন তাঁর পাশে কেউ এসে দাঁড়িয়েছিল! ম্যাথুস মারা যায় নি এ অনুভূতিই-বা কেন হয়েছিল তাঁর? তবে কি ম্যাথুসের অতৃপ্ত আত্মার উপস্থিতিই তিনি অনুভব করেছিলেন? ঘরের ভেতর এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া তাঁর সর্বাঙ্গ কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। উদ্ভট কল্পনা ভেবে চিন্তাটাকে তিনি জোর করে মন থেকে দূর করতে চাইলেন।

এ অনুভূতি কিন্তু তাঁর আগেও হয়েছিল। আকস্মিক ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এমন সব মানুষের শব-ব্যবচ্ছেদের সময় তিনি বিদেহী কারও

উপস্থিতি অনুভব করে অসহায় বোধ করেছিলেন। আত্মার বিনাশ নেই এ মতবাদে তিনি বিশ্বাসী, জন্মান্তরবাদও তিনি বিশ্বাস করেন। হয়তো দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মা পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে বিদায় নেয় না, হয়তো আরও কিছুকাল সে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায়। ডাঃ পিল্লাই অবসর সময় দেহ ও আত্মার পরস্পর বিচ্ছেদের সঙ্কীর্ণ সীমারেখা নিয়ে অনেক পড়াশুনো করেছেন। বিদেহী আত্মা যে জীবিত মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে সক্ষম, সে কথা ডাঃ পিল্লাই মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন।

তাঁর গভীর চিন্তায় বাধা পড়ল। পাশেই ছোট একটা গোল টেবিলের ওপর টেলিফোনটা ছিল। ওটা হঠাৎ বেজে ওঠল। কিন্তু সাধারণ যে ভাবে ক্রিং ক্রিং করে বাজে তেমন ভাবে নয়, অনেকটা অস্পষ্ট, মৃদু ভাবে। যেন টেলিফোনে কোনো যান্ত্রিক গোলযোগ হয়েছে। তবে ওটা যে বাজছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ডাঃ পিল্লাই হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা কানে, তুললেন। মাউথ-পীসে মুখ লাগিয়ে তিনি বললেন, "ডাঃ পিল্লাই বলছি, আপনি কে ?"

উত্তরে একটা ফিস্‌ফিস্‌ শব্দ তাঁর কানে এল, কথা কিছুই বোঝা গেল না।

"আপনার কথা আমি শুনতে পাচ্ছি না।" তিনি বললেন।

আবার সেই ফিস্‌ফিস্‌ ধ্বনি। তারপর সব চুপচাপ।

ডাঃ পিল্লাই মিনিট খানেক রিসিভারটা কানে লাগিয়েই দাঁড়িয়ে রইলেন, যেন তিনি—সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছেন ! যখন বুঝলেন, ওপাশ থেকে আর কোনো সাড়া-শব্দই আসছে না তখন তিনি এক্সচেঞ্জকে ফোন করলেন। নিজের নাম্বারটা জানিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এখুনি কেউ আমাকে ফোন করেছিল ; কোন নাম্বার থেকে বলতে পারেন ?"

সামান্য স্তব্ধতার পর তিনি তাঁর প্রশ্নের জবাব পেলেন। ওটা করা হয়েছিল জেলখানা থেকে। তিনি ওই নাম্বারে ডায়াল্‌ করলেন।

"আমাকে কে এইমাত্র ফোন করেছিল ? আমি ডাঃ পিল্লাই বলছি। একটা কথাও আমি শুনতে পাইনি।"

পরিষ্কার কণ্ঠে জবাব এল।

"আপনার বোধহয় ভুল হয়েছে ডাগ্‌দার সাব্, আমরা কেউ আপনাকে ফোন করিনি।"

"কিন্তু এক্সচেঞ্জ যে বলল জেলখানা থেকেই ফোন করা হয়েছে ?"

"এক্সচেঞ্জ নিশ্চয়ই ভুল করেছে।" জবাব ভেসে এল।

"আশ্চর্য ! কে কথা বলছ, ওয়ার্ডার রামানুজম, তাই না ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, সাব্।"

"আচ্ছা, রেখে দিলাম।"

ডাঃ পিল্লাই আরামকেদারায় গা এলিয়ে দিলেন। ঘুরে-ফিরে টেলিফোনের অদ্ভুত ব্যাপারটা তাঁর মনে একটা খট্‌কার সৃষ্টি করতে লাগল। ভুল করে অনেকবারই তাঁর টেলিফোন বেজে উঠেছে, কিন্তু অত মৃদুভাবে কখনও বাজেনি, অমন চাপা দুর্বোধ্য গলায় কেউ তাঁকে কথাও বলেনি। ব্যাপারটা তাঁকে ভাবিয়ে তুলল। নিজের অজান্তেই তিনি সারা ঘরে পায়চারি শুরু করলেন। একটা ক্ষীণ সন্দেহ, একটা অদ্ভুত চিন্তা, তাঁর মনে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল।

"কিন্তু তা অসম্ভব।" আপন মনেই বলে উঠলেন তিনি।

পরদিন সকালবেলা যথারীতি তিনি জেলখানায় গেলেন। আশ্চর্য, অদৃশ্য কারও উপস্থিতি আবার তাঁর মনে চাড়া দিয়ে উঠল। কেন জানি তাঁর মনে হতে লাগল, গতকাল যার ফাঁসী হয়েছে সে-ই যেন তাঁর আশে-পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জেলখানার অঙ্গনে সেই অনুভূতিটা প্রবল হয়ে উঠল, আরও প্রবল হল যখন তিনি ফাঁসীর আসামীকে যে কুঠুরিতে রাখা হয় তার দরজার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

অনুভূতিটা ক্রমে এতই প্রবল হয়ে উঠল যে ওই কুঠুরির মধ্যে যার উপস্থিতি তিনি অনুভব করছিলেন, তার দেখা পেলেও হয়তো তিনি

বিস্মিত হতেন না। দরজাটা পেরিয়ে, সরু বারান্দার মত পথের শেষ প্রান্তে পৌঁছে সত্যিই তিনি ঘাড় ফেরালেন, যেন ওকে দেখবেন আশা করেছিলেন।

সমস্তক্ষণ একটা দারুণ আতঙ্ক তাঁর বুকে পাষাণ ভারের মত চেপে বসেছিল—এই অদৃশ্য উপস্থিতি তাঁকে বিচলিত করে তুলল। হতভাগ্য সেই আত্মা যেন কিছু বলতে চায়, এটা তিনি মনপ্রাণ দিয়ে অনুভব করলেন। সমস্ত ব্যাপারটা যে কাল্পনিক, তাঁর উর্বর মস্তিষ্কের উদ্ভট চিন্তার পরিণাম, এ কথা কিন্তু একবারও তাঁর মনে হল না। হ্যাঁ, ম্যাথুসের আত্মা জেলখানার মধ্যেই আটকা পড়েছে।

হাসপাতালে ঘণ্টা ছু'য়েক কাজের মধ্যে তিনি নিজেকে ব্যস্ত রাখলেন। সর্বক্ষণ কিন্তু একটা অদৃশ্য কিছুর উপস্থিতি তিনি অনুভব করছিলেন ; তবে হাসপাতালে সে প্রভাবটা অত নয়, যতটা জেলখানার মধ্যে। জেলখানার কাজ সেরে ফেরার আগে তাঁর ধারণাটা যাচাই করার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি বধ্যভূমির ছাউনীতে উঁকি মারলেন। পরমুহূর্তে বধ্যভূমিতে প্রবেশের দরজাটা এক হ্যাচ্‌কা টানে বন্ধ করে তিনি সরে এলেন। তাঁর মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল।

ফাঁসির মঞ্চে কালো কাপড়ে মুখ ঢাকা আর ছু'হাত বাঁধা ঝুলন্ত এক মূর্তির অস্পষ্ট আকার তাঁর চোখে পড়ল। অস্পষ্ট হলেও চোখের ভুল তাঁর হয় নি।

ডাঃ পিল্লাইকে অনায়াসে একজন সাহসী পুরুষই বলা চলে। তিনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে সামলে নিলেন। ক্ষণিকের এই আতঙ্কের জন্য তিনি মনে মনে লজ্জাই বোধ করলেন! যুক্তি দিয়ে তিনি বিশ্লেষণ করলেন, আকস্মিক স্নায়বিক চাপই তাঁর মনের এই অবস্থার কারণ। আত্মা এবং আধিভৌতিক ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ট কৌতূহল থাকা সত্ত্বেও বধ্যভূমিতে দ্বিতীয়বার উঁকি মারার সাহস কিন্তু তাঁর হ'ল না। মনের জোর যেন তিনি হারিয়েফেললেন। হতভাগ্য ম্যাথুসের আত্মা যদিতাঁকে

কিছু বলতে চায় কিংবা তাঁর সঙ্গে কোন ব্যাপারে যোগাযোগ করতে চায়, তবে দূর থেকেই সেটা ঘটুক—তাই তিনি মনেপ্রাণে চাইলেন। তাঁর মনে হ'ল ওটার গতিবিধি যেন অনেকটা সীমিত। জেলখানার অঙ্গন, যে কুঠুরিতে ফাঁসীর আসামীকে রাখা হয়, এবং বধ্যভূমি ঘিরেই ওটা ঘোরাফেরা করছে। অবশ্য এটা তাঁর অনুমান।

হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়ায় তিনি তাঁর অফিস ঘরে ফিরে এসে গত রাত্রে যে ওয়ার্ডার টেলিফোনে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিল তাকে ডেকে পাঠালেন।

"কাল রাতে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলার আগে কেউ আমাকে ফোন করে নি বলেছিলে। তোমার ভুল হয় নি তো?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

ডাঃ পিল্লাই লক্ষ্য করলেন লোকটি সামান্য ইতস্ততঃ করল!

"নাঃ…" লোকটি জবাব দিল, "আপনি ফোন করার আধঘন্টা আগে থেকেই আমি টেলিফোনের পাশে বসেছিলাম। কেউ ফোন করলে আমি দেখতে পেতাম।"

"তুমি তবে কাউকে দেখনি?" ডাঃ পিল্লাই এবার একটু জোর দিয়েই কথাটা বললেন।

লোকটির হাব-ভাবে একটা অস্বস্তির চিহ্ন স্পষ্ট ফুটে উঠল।

"না, ডাগ্দার সাব্, আমি কাউকে দেখিনি।" সে যেন ইচ্ছে করেই একটু জোর জবাব দিল।

ডাঃ পিল্লাই তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

"কিন্তু তোমার হয়তো মনে হয়েছিল ঘরে কেউ আছে?" অনেকটা নিরাসক্ত ভাবেই তিনি এবার প্রশ্ন করলেন।

ওয়ার্ডার রামানুজ এবার যেন একটু থতমত খেল। তার মনের মধ্যে যে একটা দ্বন্দ্ব চলছে তা বুঝতে অভিজ্ঞ ডাঃ পিল্লাইয়ের দেরী হ'ল না।

"আপনি হয়তো ভাববেন আমার তন্দ্রা এসেছিল কিংবা আমি এমন কিছু খেয়েছিলাম যা আমার সহ্য হয়নি···"

ডাঃ পিল্লাইয়ের নিরাসক্ত ভাবটা মুহূর্তে কেটে গেল। রামানুজমের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে তিনি বলে উঠলেন, "ওসব কিছুই আমি ভাবব না ; বরং তুমিই বলতে পার রাত্রের খাওয়া-দাওয়ার পর আমি যখন বসেছিলাম তখন আমার ঝিমুনি এসেছিল ; তাই টেলিফোন বাজার শব্দটা হয়তো আমি স্বপ্নের ঘোরেই শুনেছিলাম।" ওয়ার্ডারকে আশ্বস্ত করার জন্যই তিনি কথাগুলো বললেন। "আরও একটা কথা, টেলিফোনটা কিন্তু যেমন বাজা উচিত তেমন বাজেনি। আমি ওটার পাশেই বসেছিমাম, তবু কোনমতে ক্রিং ক্রিং শব্দটা আমার কানে এসেছিল। রিসিভার কানে লাগিয়ে আমি শুধু কার যেন ফিস্‌ফিসানি শুনেছিলাম। কিন্তু তুমি যখন কথা বলেছিলে তা স্পষ্ট এবং জোরেই শুনেছিলাম। আমার বিশ্বাস একটা কিছু—মানে কেউ টেলিফোনের এধারে ছিল। তুমিও সে সময় ঘরে ছিলে, কিন্তু কাউকে না দেখলেও কারো উপস্থিতি তুমি অনুভব করেছিলে, তাই না ?"

লোকটি একবার সায় দিয়ে ঘাড় দোলাল।

"ডাগ্‌দার সাব্, আমি ভীতু নই।" সে বলল,"তা ছাড়া আজগুবি কল্পনা আমার মাথায় আসে না। কিন্তু তবু বলব, ঘরে অদৃশ্য কিছু একটা ছিল। ওটা যেন টেলিফোনের চারপাশেই ঘোরাফেরা করছিল। এমন নয় যে, বাতাসের শব্দে আমার মনের ভুল হয়েছিল, কারণ কাল রাতে বাতাস ছিল না বললেই চলে। ওটা নিশ্চয়ই টেলিফোন ডাইরেক্টরির পাতা উল্টাচ্ছিল। বাতাস ছাড়াই যে ভাবে একটার পর একটা পাতা খস্‌খস্ আওয়াজ করে উলটে যাচ্ছিল, তাতেই আমার ও কথা মনে হয়েছিল। যেন কারও টেলিফোন নাম্বার খুঁজছে। আমার খুব কাছে ওটার উপস্থিতি আমি অনুভব করেছিলাম। বিশ্বাস করুন ডাগ্‌দার সাব্, আমার গায়েই শুধু কাঁটা দেয়নি, মাথার চুলও

খাড়া হয়ে গিয়েছিল। আর···আর···ওটা যখন আমার পাশে এসেছিল তখন কেমন একটা স্যাঁতসেতে ঠাণ্ডায় আমি কেঁপে উঠেছিলাম।"

ডাঃ পিল্লাই রামানুজমের মুখের দিকে সরাসরি তাকালেন।

"তোমার কি কার-ও কথা মনে হয়েছিল?" আচমকা তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

লোকটি আবার ইতস্ততঃ করল, তারপর জবাব দিল, "হ্যাঁ, সাব্, কাল যার ফাঁসি হয়েছিল তার কথা···"

ডাঃ পিল্লাই সমর্থনসূচকভাবে ঘাড় দোলালেন।

"ব্যাপরটা তাই।" তিনি অনেকটা যেন আপন মনেই বলে উঠলেন। ওয়ার্ডারের দিকে ফিরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আজ রাতেও কি অফিস ঘরে তোমার ডিউটি আছে?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ সাব্।" লোকটার সর্বাঙ্গ একটা অজানা আতঙ্কে কেঁপে উঠল।

"তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি।" ডাঃ পিল্লাই তাকে আশ্বস্ত করে বললেন, "কাল আমারও তোমার মতই অবস্থা হয়েছিল। ওটা যাই হোক না কেন, মনে হচ্ছে যেন আমাকে কিছু বলতে চায়। ভাল কথা, কাল রাতে জেলখানায় কোনো গোলমাল হয়নি তো?"

"হ্যাঁ, হয়েছিল। কম করেও দশ বারজন কয়েদী ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে চেঁচামেচি করে উঠেছিল। তবে কারো ফাঁসি হবার পর প্রথম দু'একটা রাত এমন হয়। আমি আগেও এমন হতে দেখেছি, তবে কাল রাতে একটু বাড়াবাড়িই হয়েছিল।"

"হুঁ! আচ্ছা, ওটা—মানে অদৃশ্য ওই বস্তুটা যদি আজও টেলিফোনের কাছে আসতে চায়, তবে ওটাকে সে সুযোগ দিও। আমার যতদূর মনে হচ্ছে, ওটা কাল যে সময় এসেছিল আজও সে সময়ে আসবে। তুমি বরং এক কাজ কর—ও সময়টা, ধর রাত সাড়ে নটা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত, ঘরের বাইরেই থেকো। আমি আমার

বাড়িতে টেলিফোনের পাশেই থাকব। যদি ওই সময়ের মধ্যে এখান থেকে আমি কোনো ফোন পাই তবে তা সেরে আমি তোমাকে ফোন করে জেনে নেব সত্যিই কেউ আমাকে ফোন করেছিল কিনা! বুঝতে পেরেছ?"

"আজ্ঞে, কোনো বিপদ ঘটবে নাতো?"

"আমার বিশ্বাস সে ভয় করার কারণ নেই।" ডাঃ পিল্লাই তাকে অভয় দিয়ে বললেন। পরক্ষণেই বধ্যভূমিতে তাঁর আতঙ্কের হেতু মনে পড়তেই তিনি কেঁপে উঠলেন। ওয়ার্ডার অন্য দিকে তাকিয়েছিল তাই এসব কিছু লক্ষ্য করল না।

রাত সাড়ে ন'টার সময় তিনি পড়বার ঘরে একা বসেছিলেন—বসেছিলেন বললে ভুল হবে, যেন কিছু একটা ঘটবে তারই প্রতীক্ষা করছিলেন। খানিক আগেই তিনি রাতের খাওয়া সেরেছেন। পারলৌকিক ব্যাপার সম্বন্ধে অনেক পড়াশোনা করে তাঁর মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, মুক্তি পায়নি এমন আত্মা একটা নির্দিষ্ট সময়েই নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়—তার হেরফের বড় একটা হয় না, বিশেষ করে সেই আত্মা যদি মানুষের সাহায্যপ্রার্থী হয়, যেমন হয়েছে এ ব্যাপারে। ম্যাথুসের আত্মা যে একটা যন্ত্রণায় ভুগছে এবং সেই বিষয়ে তাঁকে কিছু বলতে চায় তা তিনি অনুভব করছিলেন। মৃত্যুর পর কিছুদিন, পৃথিবীতে বিচরণশীল এ-সব অতৃপ্ত কিংবা মুক্তি না-পাওয়া আত্মার নিজের রূপ প্রকাশের অর্থাৎ দেখা দেবার এবং মানুষকে তার ইচ্ছে জানাবার ক্ষমতা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়। তারপর যতই ওটা পৃথিবী ছেড়ে ওপরে উঠতে থাকে, ওই ক্ষমতাও ততই কমে আসে। তবে দেহ থেকে বেরিয়ে আসার প্রথম দু'একদিন ওটা দুর্বল থাকে। কারণ নতুন অবস্থা ও নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে ওটার দিন কয়েক সময় লাগে। তাই ডক্টর পিল্লাইয়ের ধারণা হয়েছিল আজও হয়ত তিনি টেলিফোনে স্পষ্ট কিছু শুনতে পাবেন না, যদিও

গতকালের মত অত অস্পষ্ট হবে না। ঠিক তখুনি টেলিফোনটা বেজে উঠল। গত রাতের মত অত ক্ষীণ নয় কিন্তু তবু সাধারণ যেভাবে বাজে অত জোরেও নয়।

ডাঃ পিল্লাই প্রায় লাফিয়ে উঠে রিসিভারটা কানে তুলে ধরলেন আর তখুনি একটা চাপা কান্নার ফোঁপানি তার কানে ভেসে এল। কান্নার অদম্য দমকে যে কাঁদছে তার বুক যেন ফেটে যাচ্ছে!

ডাঃ পিল্লাই যেন বোবা হয়ে গেছেন! একটা হিম-শীতল পরশ তিনি বুকের ভেতর অনুভব করছেন, কিন্তু তবু সেই কান্নার মধ্যে যে একটা করুণ আবেদন ছিল তা তাকে বিচলিত করে তুলল। যে কাঁদছে, সে যেই হোক না কেন, তাকে সাহায্য করার জন্য তাঁর সেবার্ত মন উন্মুক্ত হয়ে উঠল।

"কে, কে তুমি?" নিজের গলার স্বরই তাঁর কাছে বিকৃত শোনাল। "আমি ডাঃ পিল্লাই কথা বলছি। বল, তোমার জন্য আমি কি করতে পারি?"

আস্তে আস্তে কান্নার শব্দটা মিলিয়ে গেল, যেন যে কাঁদছিল সে অতিকষ্টে নিজেকে সামলে নিল। তারপরই ফিস্‌ফিস্ করে বলা কথাগুলো ডাঃ পিল্লাইয়ের কানে ভেসে এল।

"ডাক্তার সাহেব, আমি বলতে চাই···আমি বলতে চাই··· আমাকে বলতেই হবে···"

"কি বলতে চাও, বল আমাকে।" ডঃ পিল্লাই একটু একটু করে সাহস ফিরে পাচ্ছেন।

"না, না, আপনাকে নয়··যিনি আমার কাছে আসতেন তাঁকে বলতে চাই। আপনাকে যা বলছি তা যদি তাঁকে একবারটি বলেন! আমি কিছুতেই আমার কথা তাঁকে শোনাতে পাচ্ছি না।"

"কে তুমি?" ডাঃ পিল্লাই হঠাৎ প্রশ্ন করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল না। তারপরেই ফিস্‌ফিস্ করে সে কথা

বলছিল, সে বললো, "আপনি তো জানেন, আমি কে। আমার ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে। জেলখানা ছেড়ে আমি বেরুতে পারছি না··· বড় কষ্ট হচ্ছে।···আপনি ওই ভদ্রলোককে আপনার বাড়িতে ডেকে পাঠাবেন? আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

"তুমি কি পাদ্রী সাহেবের কথা বলছ?" ডাক্তার শুধোলেন।

"হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন। কাল যখন আমাকে জেলখানার উঠোন দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন তিনি আমার সদ্‌গতির জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। তাঁর কাছে বলতে পারলে আমার আর এত কষ্ট হবে না।—বলবেন তাঁকে আপনি?"

ডাঃ পিল্লাই মুহূর্তকালের জন্য ইতস্ততঃ করলেন। কারাগারের পাদ্রী, ফাদার ডি'সুজার কাছে কি তিনি বলবেন? গতকাল যে খুনী আসামীর ফাঁসি হয়েছে সে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চায়, এই! ফাদার ডি'সুজা কি ভাববেন না ডাক্তারেরই মাথার চিকিচ্ছের দরকার। কিন্তু টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে ম্যাথুসের আত্মাই যে তাঁর সঙ্গে কথা বলছে সে বিষয়ে তাঁর কোনো সন্দেহ-ই নেই। ওর যে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে সেটা তিনি মনপ্রাণ দিয়ে অনুভব করলেন। ও যে ফাদার ডি'সুজার কাছে কি বলতে চায় ডাঃ পিল্লাইয়ের মত বুদ্ধিমান লোকের তা বুঝতে দেরী হল না।

"বেশ আমি তাঁকে আসতে বলব।" শেষ পর্যন্ত কথাটা যেন তাঁর মুখ ফস্‌কেই বেরিয়ে গেল।

"ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ! আপনি তাঁকে নিশ্চয়ই আনবেন।" কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে আসছিল।

"আগামী কাল রাত্রেই আনা চাই।" কণ্ঠস্বর বলল। "আমি আর বেশীক্ষণ কথা বলতে পারছি না। আমাকে আবার সেটা দেখতে যেতে হবে—হায় ভগবান!"

নতুন করে ফোঁপানির শব্দ আবার ভেসে এল, কিন্তু ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে আসছে।

একটা প্রচণ্ড ভয় অথচ ঔৎসুক্য ডাঃ পিল্লাইকে যেন ঘিরে ধরল।

"কি দেখতে যেতে হবে ?" তিনি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন। তোমার কি ঘটেছে একটু বল আমায়।"

"না···না, আমি বলতে পারব না···" কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে গেল।

ডাঃ পিল্লাই রিসিভারটা কানে লাগিয়ে তবু দাঁড়িয়েই রইলেন, কিন্তু আর কোন কথা ভেসে এল না। তিনি রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন, আর তখুনি অনুভব করলেন তাঁর সমস্ত শরীর ঘামে যেন ভিজে গিয়েছে, কপালে যে ঘাম জমেছে তা কেমন যেন শীতের সকালের শিশির বিন্দুর মত ঠাণ্ডা! তাঁর বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফাচ্ছে! নিজেকে সামলাবার জন্য তিনি তাড়াতাড়ি চেয়ারে বসে পড়লেন। একবার মনে হল কেউ বোধ হয় তাঁর সঙ্গে সাংঘাতিক রসিকতা করছে, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারলেন, তা নয়। কৃতকর্মের জন্য একটা অনুতপ্ত আত্মা যে অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে সে বিষয়ে তাঁর মনে কোনো সন্দেহ-ই ছিল না। বিংশ শতাব্দীতে, এই শহরের বুকে, তাঁর কোয়ার্টারের আরামদায়ক কক্ষে এইমাত্র তিনি ম্যাথুসের আত্মার সঙ্গে কথা বললেন। আশ্চর্য ও অবিশ্বাস্য ব্যাপার!

কিন্তু এ নিয়ে বেশি ভাববার সময় ছিল না। তিনি রিসিভারটা আবার তুলে ধরে জেলখানায় ফোন করলেন। বেশ কিছুক্ষণ পর ওপাশ থেকে মানুষের কণ্ঠস্বর তিনি শুনতে পেলেন।

"ওয়ার্ডের রামানুজম্ ?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

কাঁপা কাঁপা গলায় উত্তর এল, "হ্যাঁ, ডাগ্‌দার সাব্।"

"কিছু দেখেছ তুমি ?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ সাব্। ও এসেছিল। আমি ওকে টেলিফোনের ঘরে যেতে দেখেছি,···মানে···একটা ছায়ামত কি যেন ঘরে ঢুকেছিল!"

"তুমি কি ওর সঙ্গে কথা বলেছ ?"

"আজ্ঞে না, আমি ভয়ে আধমরা হয়ে গিয়েছিলাম সাব্, শুধু ভগবানকে ডেকেছি। কয়েদীদের মধ্যে একটা চেঁচামেচি উঠেছিল, এখন আবার সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আমার মনে হয় ও ফাঁসির ছাউনির দিকে গেছে।"

"তোমার অনুমান বোধ হয় মিথ্যে নয়, আজ আর কিছু ঘটবে বলে আমার মনে হয় না।"

সেই রাতেই ফাদার ডি'সুজাকে পরের দিন নৈশ ভোজনের নিমন্ত্রণ জানিয়ে তিনি একটা চিঠি লিখলেন। ফাদার যেন অবশ্যই আসেন, খুব জরুরী একটা ব্যাপারে তিনি তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে চান। এ কথা লিখতেও ভুললেন না।

* * *

পরের দিন রাত সাড়ে আটটা নাগাদ ফাদার ডি'সুজা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এলেন। খাবার ঘরটা ডাক্তারের পড়ার ঘরের ঠিক পাশেই। ডাঃ পিল্লাইয়ের নির্দেশে যোশেফ ভাল ভাল রান্না করেছিল। খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে পর যোশেফ টেবিল পরিষ্কার করে দু' পেয়ালা কফি দিয়ে গেল। একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে ডাঃ পিল্লাই বললেন, "আপনাকে যে কথা বলার জন্য আজ কষ্ট দিয়েছি, তা শোনার পর দয়া করে আমাকে পাগল ভাববেন না, এই আমার অনুরোধ।"

ফাদার ডি'সুজা হাসলেন।

"হ্যাঁ, সে অঙ্গীকার আমি অনায়াসে করতে পারি।" তিনি জবাব দিলেন।

"ভাল। গত কাল এবং পরশু রাতে দু'দিন আগে যার ফাঁসি হয়েছিল তার সঙ্গে আমি টেলিফোনে কথা বলেছি।"

ডি'সুজা হাসলেন না। তিনি চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর মুখে বিরক্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট।

'ডাঃ পিল্লাই !" তিনি বেশ অভিযোগের কণ্ঠেই বললেন, "আমি আপনার আতিথেয়তার অমর্যাদা করতে চাইনে, কিন্তু সত্যিই কি এই উদ্ভট কথা শোনাবার জন্যে আপনি আমাকে ডেকে এনেছেন ?"

"রাগ করবেন না, ফাদার ডি'সুজা।" ডাঃ পিল্লাই অনেকটা অনুনয়ের কণ্ঠে বললেন, "আপনি আমাকে শেষ করতে দিন। কাল রাতে ও আমাকে অনুরোধ করেছিল আপনাকে এখানে আনার জন্য। ও আপনাকে কিছু বলতে চায়।"

"আমি আপনার কথা শুনতে চাই না।" ফাদার ডি'সুজার কণ্ঠস্বর থেকে যেন ভর্ৎসনা ঝরে পড়ল। "মৃতেরা কখনই ফিরে আসে না। মৃত্যুর পর কি অবস্থায় তারা থাকে তা আমাদের জানা নেই, কিন্তু পার্থিব সমস্ত সম্পর্ক যে তাদের চুকে যায় সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।"

"কিন্তু আমার কথা এখনো শেষ হয়নি, ফাদার।" ডাক্তার বললেন। "দু'রাত আগে আমার টেলিফোনটা খুব আস্তে আস্তে বেজে উঠেছিল, ফিস্‌ফিস্ করে কেউ যেন আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল। আমি এক্সচেঞ্জকে তারপরেই ফোন করে জানতে পারি 'কলটা' এসেছিল জেলখানা থেকে। আমি ওখানে ফোন করি। ওয়ার্ডার রামানুজম আমাকে জানায় জেলখানা থেকে কেউ আমাকে ফোন করেনি। তবে কেউ যে টেলিফোনের ঘরে এসেছিল এ অনুভূতি ওর হয়েছিল।"

"লোকটা বোধহয় খুব নেশা করে।" ফাদার ডি'সুজা তীব্র কণ্ঠে বললেন।

"আপনি ওর ওপর অবিচার করছেন ফাদার ডি'সুজা।" ডাঃ পিল্লাই এবার আহত কণ্ঠে বললেন। "ওয়ার্ডারদের মধ্যে ও লোকটাই সবচেয়ে বিশ্বাসী, কোনরকম নেশা করে না। আর তাই যদি হয়, তবে আমিও ওই অপবাদ থেকে বাদ পড়ি না, তাই না ?"

ফাদার ডি'সুজা আবার বসলেন।

"আমাকে ক্ষমা করবেন," তিনি এবার গলা নরম করে বললেন, "কিন্তু এ নিয়ে আমি কোন আলোচনা করতে প্রস্তুত নই। তা ছাড়া সমস্ত ব্যাপারটাই যে একটা রসিকতা নয় তা কি করে বুঝলেন ?"

"রসিকতাটা করবে কে ?" ডাক্তার প্রতিবাদ করে উঠলেন, তারপরই বললেন, "ওই শুনুন !"

পাশের ঘরে টেলিফোনটা বেজে উঠল, ডাঃ পিল্লাই স্পষ্ট শুনতে পেলেন।

"শুনতে পাচ্ছেন ?" তিনি ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন।

"কি শুনতে পাচ্ছি ?"

"টেলিফোনটা বাজছে।"

"না।" ফাদার ডি'সুজা একটু রাগত কণ্ঠেই জবাব দিলেন, "টেলিফোন বাজার কোনো শব্দই আমি শুনতে পাচ্ছি না।"

ডাঃ পিল্লাই কথা না বাড়িয়ে পাশের ঘরে গিয়ে রিসিভারটা কানে তুলে ধরলেন। মাউথ্-পীসে মুখ লাগিয়ে তিনি বললেন, "হ্যালো !" তাঁর অজান্তেই গতকালের মত গলাটা তাঁর আজও কেঁপে গেল। "কে কথা বলছ ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ফাদার ডি'সুজা এসেছেন। আচ্ছা, আমি তাঁকে কথা বলতে অনুরোধ করছি।"

তিনি খাবার ঘরে ফিরে গেলেন।

"ফাদার ডি'সুজা !" তিনি আবেদন-করুণ কণ্ঠে বললেন, "একজনের আত্মা যন্ত্রণা পাচ্ছে, আপনি দয়া করে ও কি বলতে চায় একবার শুনুন, আমি ভগবানের নামে আপনার কাছে অনুরোধ করছি।"

ফাদার ডি'সুজা মুহূর্তকাল ইতস্ততঃ করলেন, তারপর বললেন, "আপনার যা অভিরুচি।"

ডাঃ পিল্লাই তাঁকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে হুক্ থেকে নামিয়ে রাখা রিসিভারটা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। ফাদার ডি'সুজা রিসিভার কানে লাগিয়ে বললেন, "আমি ফাদার ডি'সুজা কথা বলছি।"

তিনি অপেক্ষা করলেন।

"আমি কিছুই শুনতে পাচ্ছি না।......হ্যাঁ, এবার যেন কিছু শোনা যাচ্ছে, কেউ ফিস্ ফিস্ করে কথা বলছে।"

"একটু চেষ্টা করুন শুনতে পাবেন ?" ডাঃ পিল্লাই উৎসাহ দিয়ে বললেন।

ফাদার ডি'সুজা আবার শোনবার চেষ্টা করলেন।

হঠাৎ রিসিভারটা কান থেকে নামিয়ে তিনি বলে উঠলেন, "কে যেন বলল, 'আমি খুন করেছি, আমি স্বীকার করছি, ক্ষমা ভিক্ষা করছি আমি।'—এ নিশ্চয়ই রসিকতা ডাঃ পিল্লাই! আপনি যে আধ্যাত্মিক ব্যাপারে একটু বেশী মাত্রায় উৎসুক তা জেনেই হয়তো কেউ আপনার সঙ্গে রসিকতা করছে। আমি এ বিশ্বাস করিনে।"

ডাঃ পিল্লাই রিসিভারটা নিজের হাতে নিলেন।

"হ্যালো, আমি ডাঃ পিল্লাই বলছি।" তিনি এক নিঃশ্বাসে বলে গেলেন, "ফাদার ডি'সুজাকে এমন কোনো প্রমাণ দিতে পার যে তুমিই কথা বলছ।"

ওপাশ থেকে উত্তরটা শুনে তিনি রিসিভার নামিয়ে রেখে বললেন, "ও বলছে আপনাকে প্রমাণ দেবে। তবে আমাদের একটু অপেক্ষা করতে হবে।"

আজকের রাতটাও বেশ গুমোট, একটা ভ্যাপ্সা গরম। ঘরের জানালাগুলো খোলাই ছিল কিন্তু একটুও বাতাস আসছিল না। ডাঃ পিল্লাই আর ফাদার ডি'সুজা প্রায় পাঁচ মিনিট নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলেন, যেন কিছু একটার জন্য অপেক্ষা করছেন, কিন্তু কিছুই ঘটল না। ফাদার ডি'সুজা অধৈর্য হয়ে বলে উঠলেন।

"আমার মনে হয় আর অপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।"

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই একটা হিমেল হাওয়া পাশের জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকে এক মুহূর্তে ভেতরকার আবহাওয়াটা সম্পূর্ণ বদলে দিল।

ভ্যাপ্‌সা গরম আর অনুভূত হচ্ছে না। বরং যেন শীত শীত করছে। ডাঃ পিল্লাই কেঁপে উঠলেন, খুব ঠাণ্ডা পড়লে যেমন মানুষ কাঁপে।

"কেমন ঠাণ্ডা হাওয়া, আপনি টের পাননি ?" ফাদার ডি'সুজাকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

"হ্যাঁ কেমন যেন শীতের মত হাওয়া।" ফাদার ডি'সুজা সম্মতি জানিয়ে বললেন।

ঘরের মধ্যে হাওয়াটা আবার যেন জেগে উঠল, একটা ঘূর্ণির সৃষ্টি হল, আর টেবিলের ওপর রাখা কয়েকটা কাগজ মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল।

"কিছু বুঝতে পারছেন ?" ডাঃ পিল্লাই আবার বললেন। একটা আতঙ্ক তাঁকে গ্রাস করতে চাইছে।

ফাদার ডি'সুজা নীরবে ঘাড় দোলালেন, তাঁর বুকের ভেতর যেন হাপর পড়তে শুরু করেছে।

"করুণাময় ঈশ্বর, শয়তানের হাত থেকে আমাদের রক্ষা কর।" বিড় বিড় করে বললেন তিনি।

"ঘরে কে যেন এসেছে !" ডাঃ পিল্লাই আতঙ্কে বলে উঠলেন।

তাঁর মুখের কথা শেষ হবার আগেই, তাঁরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেখান থেকে মাত্র পাঁচ হাত দূরে একটা অস্পষ্ট মানুষের মূর্তি আকার নিতে লাগল। শূন্যে সেটা ঝুলছে, কাঁধের একদিকে মাথা হেলে থাকায় মুখ দেখা যাচ্ছে না। তারপরই ওটা দু'হাত দিয়ে নিজের মুখটা তুলে ধরল,সোজাসুজি তাকালো ঘরে যে দু'জন পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের দিকে। ওটার দু'চোখ আর জিভ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে, গলার চারপাশে একটা গোল লাল দাগ। তারপরই মেঝের ওপর ধপ্‌ করে ভারী কিছু পড়ার শব্দ হ'ল আর সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু মিলিয়ে গেল, শুধু মেঝের ওপর পড়ে রইল একগাছা নতুন দড়ি।

বেশ কিছুক্ষণ দু'জনের মুখে কোন কথা ফুটল না। ডাঃ পিল্লাইয়ের কপাল বেয়ে দর্‌ দর্‌ করে ঘামের স্রোত নামছিল আর ফাদার ডি'সুজা

অস্ফুষ্ট কণ্ঠে প্রার্থনা করছিলেন। অসীম প্রচেষ্টায় ডাঃ পিল্লাই মনের সাহস ফিরিয়ে আনলেন। দড়িটার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে তিনি বললেন, "ফাঁসির পর থেকে ওটা পাওয়া যাচ্ছিল না।"

টেলিফোনটা আবার মৃদু বেজে উঠল। এবার আর ফাদার ডি'সুজাকে কিছু বলতে হল না, তিনি তাড়াতাড়ি রিসিভারটা কানে তুলে কিছুক্ষণ কি যেন শুনলেন।

"ম্যাথুস!" অনেকটা সংযত কণ্ঠে তিনি বললেন, "ভগবানের কাছে তোমার অপরাধের জন্য সত্যিই কি তুমি অনুতপ্ত?"

ডাঃ পিল্লাই শুনতে না পেলেও বুঝতে পারলেন ওপাশ থেকে কিছু একটা জবাব এল।

ফাদার ডি'সুজা রিসিভারটা কানে লাগিয়েই দু'হাঁটু মুড়ে, দু'চোখ মুদে প্রার্থনার ভঙ্গীতে স্তব করতে লাগলেন, তারপর বলে উঠলেন, "ঈশ্বর তোমার আত্মার মঙ্গল করুন।"

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। 'আর কিছু শুনতে পাচ্ছি না।' বলে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন।

ডাঃ পিল্লাই ঘণ্টা বাজিয়ে যোশেফকে ডাকলেন। সে ঘরে ঢুকতেই তিনি বললেন, "ওই দড়িটা নিয়ে যাও···ওটা পুড়িয়ে ফেলো যোশেফ।"

মুহূর্তের নিস্তব্ধতা!

"এ ঘরে তো কোনো দড়ি নেই সাহেব।" যোশেফ জবাব দিল।

(বিদেশী ছায়ায়)

।০।

চীনা পুতুল

ক্লাব ঘরে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির মুখোমুখি আমরা বসেছিলাম। ভদ্রলোকের চুলগুলি তুষারের মত সাদা, গালের চামড়া কুঁচকে গেছে, দু'হাত দস্তানায় ঢাকা। মৃদু কণ্ঠে তিনি তাঁর কাহিনী বলছিলেন ঃ

আমার তখন যুবা বয়স, বাবা মা দু'জনেই মারা গেছেন। তখন এত ঘিঞ্জি বসতি ছিল না, লোকজনের এত ভীড়ও ছিল না। বাবা যে ছোট দোতলা বাড়ি করেছিলেন আমিই তার মালিক এবং একমাত্র বাসিন্দা। একমাত্র বললে হয়তো ভুল হবে কারণ নবীনও অনেকদিন ধরে ছিল। নবীন আমাদের পুরনো চাকর, ঘরের কাজ-কর্ম, রান্না-বান্না সবই সে করে। আমার একটা শখ ছিল প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য জিনিস-পত্র সংগ্রহ করা, এর জন্য কম টাকা আমি খরচ করিনি। এই সময় হঠাৎ একটা লাক্ষার বাক্স আমার হাতে এল। চমৎকার বাক্সটি! সোনালী বার্নিশ, মসৃণ আর যেন ঝক্‌ঝক্ করছে। আট ইঞ্চি লম্বা, চার ইঞ্চি চওড়া আর ভেতরের গভীরতা প্রায় পাঁচ ইঞ্চি।

বাক্সটার ঢাক্‌নার ওপর কালো আলখাল্লা পরা এক চীনার ছবি। তার ডান হাতে উদ্যত তরোয়াল। ছবিটা এত জীবন্ত যে চমকে যেতে হয়। ছবির মুখটা অত্যন্ত ভয়াবহ হলেও শিল্পীর শিল্প-নৈপুণ্যের তারিফ করতে হয়। নিপুণ হাতে ছোট্ট একটা মুখের মধ্যে তিনি হিংসা ও ঘৃণার অভিব্যক্তি এমন নিখুঁত ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে হঠাৎ দেখলে মনে হয় জীবন্ত মুখ। সময় ও কালের ঝড়-ঝাপ্‌টা উপেক্ষা করে ছবিটা অম্লান রয়েছে।

বাক্সটা বাড়িতে এনে আমি দেখলাম, ওটা তালা বন্ধ। দোকানে আমাকে কোনো চাবি দেয়নি,আমিও তখন অত খেয়াল করিনি। আমি

ওটা তুলে চাবির ছোট্ট ফুটোটা পরীক্ষা করছি এমন সময় আমার মনে হল, বাক্সর মধ্যে যেন কিছু একটা নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে ! আমি একটু অবাকই হলাম কারণ ওই বন্ধ বাক্সর মধ্যে কোনো জীবন্ত প্রাণী থাকতে পারে তা আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

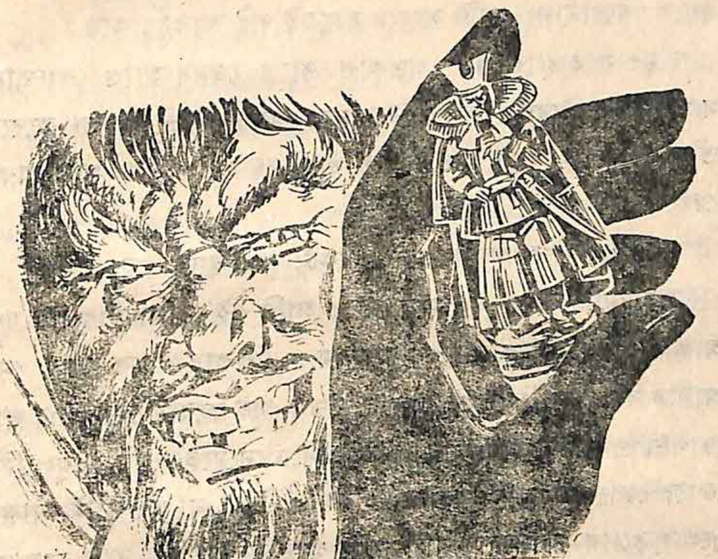
একটা ছোট স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে আমি বাক্সর তালাটা খুলে ফেললাম। ঢাক্না খুলেই আমি চমকে উঠলাম। একজোড়া ক্ষুদে কালো চোখ আমার দিকে তাকিয়ে আছে। কুচকুচে কালো চোখে যেন শাণিত দৃষ্টি। চোখ দু'টো একটা হলদে পুতুলের মত মুখের ওপর বসানো। পুতুলের মুখটা মনে হয় সূক্ষ্ম, নরম চামড়া দিয়ে তৈরী কারণ মানুষের মুখের চামড়ার সঙ্গে তার এতটুকু প্রভেদ আমার চোখে পড়ল না। আমি বাক্সর মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একটা আঙুল দিয়ে ওটার গাল স্পর্শ করলাম আর সঙ্গে সঙ্গে আঙুলটা সরিয়ে আনলাম ! আমি হলপ করে বলতে পারি, কোন জীবিত মানুষের গালে আঙুল ছোঁয়ালে যে রকম অনুভূতি হয় আমারও ঠিক সেই রকম অনুভূতি হয়েছিল। এই ক্ষুদে মূর্তিটার শরীর সাড়ে তিন ইঞ্চির বেশী হবে না, কিন্তু হলদে মুখের সঙ্গে শরীরের আকৃতিগত সামঞ্জস্য এত নিখুঁত যে, মনে হয় যেন শিল্পী সব কিছু মেপে মূর্তিটাকে বানিয়েছেন। মূর্তিটার গায়ে কালো সিল্কের আলখাল্লার মত একটা পোষাক, পায়ে জুতো। কোমরে একটা কারুকার্য করা তরোয়ালের খাপ, খাপের ওপর দিকে তরোয়ালের হাতলটা দেখা যাচ্ছে। আমি দু'আঙুল দিয়ে সন্তর্পণে হাতটা চেপে ধরে তরোয়ালটা বের করে আনলাম। ওটা আকারে একটা দেশলাইয়ের কাঠির মত কিন্তু ক্ষুর-ধার। আমি ওটাকে আবার খাপে ঢুকিয়ে বাক্সর ঢাক্নার ওপর যে ছবিটা ছিল সেটার দিকে তাকালাম। আমার মনে কোনো সন্দেহ রইল না যে ওই ছবিটারই অবিকল হল মূর্তিটা।

আমি কৌতূহলী হয়ে মূর্তির একটা হাত আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। আশ্চর্য ! চামড়ার তলায় হাড়, শিরা-উপশিরা সবই যেন আমি অনুভব করতে পারছি ! আঙুলগুলিও আলাদাভাবে

নাড়ানো যাচ্ছে, প্রত্যেকটি আঙুলের ডগায় ছুঁচলো নখ। বাক্সর ঢাক্‌নার তলার দিকে চীনা ভাষায় কি যেন লেখা ছিল। আমি ঢাক্‌না বন্ধ করে বাক্সটাকে একটা টেবিলের ওপর রেখে দিলাম।

সেদিন রাত্রে আমার ফিরতে অনেক দেরি হল, প্রায় একটা। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় আমার শোবার ঘরে যাব এমন সময় মনে হল একতলায় যে ঘরে বাক্সটা রেখেছিলাম, সে ঘর থেকে কেমন একটা শব্দ আসছে।

আমার বাবা ছিলেন ইঞ্জিনীয়ার। বাড়িটাও তৈরি করিয়েছিলেন নিজের তত্ত্বাবধানে, অনেকটা বিলিতি কায়দায়। সদর দরজায় ইয়েল-



লকের ব্যবস্থা, ঘরের জানালাগুলি গরাদহীন হলেও দামী কাচের শার্সি লাগানো আর বসবার ঘরে শীতকালের জন্য একটা চুল্লির ব্যবস্থাও ছিল।

আমি শব্দটা শুনে ঘরের দরজা খুলে আলো জ্বাললাম। টেবিলের ওপর রাখা বাক্সটার ওপর আমার চোখ পড়তেই দেখলাম, বাক্সর ঢাক্‌নাটা খোলা। আমি একটু অবাক হয়েই বাক্সর ভেতরে উঁকি মারলাম। কি আশ্চর্য! পুতুলটা ত নেই!

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই আমি নিচে নেমে এলাম। টেবিলের

ওপর বাক্সটা আছে ঠিকই কিন্তু রাত্রে আমি ওটার ঢাক্না খোলা দেখেছিলাম, এখন সেটা বন্ধ। আমি ঢাক্না খুলতেই পুতুলটা আমার চোখে পড়ল। ক্ষুদে চোখ দু'টো অমঙ্গলভরা দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি তাড়াতাড়ি ঢাক্নাটা বন্ধ করে দিলাম। একটা অদ্ভুত জিনিস আমার নজরে পড়ল। ঢাক্নার ওপর যে চীনে লোকটার ছবি ছিল, তার তরোয়ালের ডগায় ক্ষীণ লাল রঙের ছোপ্। আমার স্পষ্ট মনে আছে গতকাল ওই ছোপ্টা আমি কিন্তু দেখিনি।

চা খেতে খেতে আমি খবরের কাগজটা খুলে বসলাম। বড় বড় হরপে শিরোনামা একটা সংবাদ সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঃ

'নৃশংস হত্যাকাণ্ড! গতকাল রাত্রে জেমস্ অ্যাণ্ড কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মিঃ প্যাটারসনকে কেউ নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। তীক্ষ্ণ অস্ত্রের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত তাঁর দেহ পথের ওপর পড়ে থাকতে দেখা যায়।'

কেন জানি না আমার মনটা একটা অস্বস্তিতে ভরে গেল।

পরদিন সকালে কি মনে করে আমি ওই বাক্সর ঢাক্নার ওপর আঁকা ছবিটা ভাল করে লক্ষ্য করলাম। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, আমার বুক যেন হিম হয়ে গেল। উদ্যত সেই তরোয়ালের ওপর লাল ছোপটা প্রসারিত হয়ে আরও একটু নিচে নেমেছে আমি আঙ্গুল দিয়ে জোরে জোরে ঘষলাম কিন্তু লাল দাগটা উঠল না। আমি বাক্সটা খুলে পুতুলের কোমরের খাপ থেকে ক্ষুদে তরোয়ালটা তুলে ধরলাম। আমার সর্বাঙ্গ যেন অবশ হয়ে গেল। সেটারও ডগায় রক্তের মত লাল ছোপ্। ঢাক্নার ওপর ছবিতে যতটুকু নেমেছে, তরোয়ালেরও ঠিক ততটুকু লাল্চে হয়ে আছে। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত তরোয়ালটা আবার খাপে পুরে বাক্সটা বন্ধ করে দিলাম।

সেদিনও খবরের কাগজে এক নৃশংস হত্যার ঘটনা চোখে পড়ল। দু'টো হত্যাই যে একই ধরনের এবং একই লোক বা দলের কাজ সে বিষয়ে পুলিসের সন্দেহ নেই। আমার মনে একটা ক্ষীণ সন্দেহ উঁকি দিতে

লাগল। লাক্ষার বাক্সে ক্ষুদে পুতুলটার সঙ্গে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কি কোনো সম্পর্ক আছে ? কিন্তু তাও কি সম্ভব ! সমস্ত ব্যাপারটাই অবিশ্বাস্য।

বাক্সর ঢাক্‌নার তলার দিকে চীনা ভাষায় যা লেখা ছিল তার ঠিক অনুলিপি করে চীনা ভাষায় দক্ষ আমার এক বন্ধুর কাছে সেটা ডাকে পাঠিয়ে দিলাম। তাকে অনুরোধ করলাম যেন লেখাটার পাঠোদ্ধার করে আমাকে ফিরতি ডাকে পাঠিয়ে দেয়। তারপর যে দোকান থেকে বাক্সটা কিনেছিলাম সেই দোকানের মালিকের সঙ্গে দেখা করে বাক্সটার ইতিহাস জানতে চাইলাম।

দোকানদার তার খাতা-পত্র দেখে বলল, "চীনদেশে তৈরী সেই লাক্ষার বাক্সটার কথা জানতে চাইছেন তো ? এই যে পেয়েছি। ওটার নম্বর ছিল ছিয়াত্তর, ত্রিশ টাকায় বিক্রি হয়েছে। আপনি ওটা জলের দামে পেয়েছেন, চাবিটা ছিল না তাই অত কম দামে ছেড়ে দিতে হয়েছে। ওটার মালিক ছিলেন মিঃ জোনস্। ভদ্রলোক একটা বিলিতি কোম্পানীতে বড় সাহেব ছিলেন, বিয়ে থা করেন নি, সংসারে কেউ ছিল না। সম্প্রতি চীনে বেড়াতে গিয়ে বাক্সটা তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি উইল করে তাঁর সমস্ত সম্পতি এক খৃষ্টান সোসাইটিকে দান করে যান, তারাই তাঁর মৃত্যুর পর কিছু জিনিস-পত্র নীলামে বিক্রীর ব্যবস্থা করেন। দোকানের মালিক বাক্সটা ওই নীলামেই কিনেছিলেন।

আমি বাড়ি ফিরে এলাম। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়লাম। গভীর রাত্রে কেন জানি না হঠাৎ আমার ঘুমটা ভেঙ্গে গেল, টেবিলের ওপর রাখা টাইম-পীসের রেডিয়াম ডায়ালে দেখলাম ঠিক বারটা বেজেছে। চারদিক নিস্তব্ধ। একটা অজানা ভয় আমার বুকে যেন পাথরের মত চেপে বসেছে ! তারপরই আমি বাইরে রাস্তায় জুতোর শব্দ শুনতে পেলাম, শব্দটা যেন আমার মাথার সামনের জানলার ঠিক তলা থেকে শুরু হয়ে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। আমি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম, মনের মধ্যে কি যেন একটা খচ্ খচ্ করছে। দোতলায় আমার শোবার ঘরের ঠিক নিচের ঘরেই লাক্ষার বাক্সটা ছিল। আমি একতলায়

নেমে ওই ঘরে ঢুকে আলো জ্বাললাম। দেখি জানালাটা খোলা, কেউ ছিট্‌কিনি খুলে রেখেছে। আমি ঘুরে বাক্সটার দিকে তাকালাম, ওটার ঢাক্‌না খোলা। আমি পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলাম, যা সন্দেহ করেছিলাম ঠিক তাই! বাক্সর ভেতরটা খালি, পুতুলটা নেই।

ঘরের জানালাটা খোলাই ছিল। বিছানায় শুয়ে এই অবিশ্বাস্য ঘটনার কথা ভাবতে ভাবতে একসময় আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। পাতলা ঘুমের মধ্যে একবার যেন মনে হল নিচের ঘরের জানলাটা বন্ধ করার শব্দ হোল। পরদিন সকালে বাক্সর মধ্যে যথারীতি পুতুলটাকে দেখতে পেলাম, আরও দেখলাম যে বাক্সর ঢাক্‌নায় এবং পুতুলের কোমরবদ্ধ তরোয়ালে লাল দাগটা বেড়ে প্রায় হাতলের কাছে পৌঁচেছে।

পরদিন সকালে কাগজে আরও একটা নৃশংস হত্যার কাহিনী পড়লাম। ধারালো অস্ত্র দিয়ে আততায়ী হত ব্যক্তিকে যেন ফালা ফালা করে ফেলেছে। পুলিস দিশেহারা হয়ে পড়েছে, সন্দেহবশে কাউকে গ্রেক্‌তার করতে পারেনি। পুলিসের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনায় সমস্ত কাগজগুলিই মুখর হয়ে উঠেছে। শুধু একটা ব্যাপার পুলিস জানতে পেরেছে তা হল নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। সুতরাং অনুমান করা কঠিন নয় যে, একটা আক্রোশই এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডগুলির মূল কারণ।

এদিকে আমিও নানা সূত্রে অনুসন্ধান করতে শুরু করলাম। অনেক ছোটাছুটির পর একটা সূত্র আমি আবিষ্কার করলাম, হত ব্যক্তিদের এক পূর্বপুরুষ ছিলেন কর্ণেল বার্টন। তাঁর সম্বন্ধে খোঁজ খবর করে জানতে পারলাম ইংরেজ আমলে তিনি ভারতের সামরিক বাহিনীতে ছিলেন এবং পরে চীনে মোতায়েন বৃটিশ সৈন্য বাহিনীতে তাঁকে বদলী করা হয়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে চীনে এক গোঁড়া ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সশস্ত্র অভ্যুত্থান কঠোর হস্তে দমন করার পুরস্কার-স্বরূপ তাঁকে সম্মানিত করা হয়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে হংকং-এ এক অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে তিনি নিহত হন।

যেদিন এই ঘটনার কথা জানতে পারলাম, সেদিনই আমার বন্ধুর কাছ থেকে চিঠি পেলাম, তিনি চীনা ভাষায় লেখা লিপিটার পাঠোদ্ধার করে

পাঠিয়েছেন। আমি সেটা পড়লাম, 'আমি প্রতিশোধ নেব।' আমার মনে আর কোন সন্দেহ রইল না যে পুতুলটা মন্ত্রপূত, এবং কর্ণেল বার্টনের ওপর বিজাতীয় আক্রোশবশে ওই গুপ্ত ধর্মীয় সম্প্রদায় ওটাকে বার্টনের আত্মীয়-স্বজন নিধন-যজ্ঞে নিযুক্ত করেছে।' আমি বাক্সর ডালাটা খুললাম, পুতুলটা যেন ব্যঙ্গভরা দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

সেদিনই আমি মনস্থির করে ফেললাম বাক্সটাকে বিদায় করতেই হবে, ওটা যেন আমার জীবনে অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেশ অনেক রাত্রে বাক্সটাকে হাতে নিয়ে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। আমার বাড়ি থেকে চেতলা ব্রীজটা বেশী দূরে নয়। বর্ষাকাল, গঙ্গার জল দু'কূল ছাপিয়ে গেছে। ঝির্‌ঝির্ করে বৃষ্টি পড়ছিল, ব্রীজের ওপরটা একেবারে ফাঁকা। সুযোগ বুঝে আমি বাক্সটাকে সজোরে গঙ্গাবক্ষে বিসর্জন দিলাম। ঝপ্ করে একটা শব্দ হল আর ঠিক সেই সময় টালীগঞ্জ থানা থেকে ঢং ঢং করে মধ্যরাত্রি ঘোষণা করল। ঘণ্টাধ্বনি মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নদী থেকে একটা চীৎকার আমার কানে ভেসে এল, মানুষের চীৎকার।

এমন সময় ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি নামল আর বৃষ্টির শব্দ ভেদ করে আরও একটা শব্দ আমার কানে ভেসে এল। কেউ যেন গঙ্গায় প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে হাত-পা ছুঁড়ে জীবন-মরণ সংগ্রাম করছে। কয়েক মিনিট মাত্র, তারপরই আমি পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম, কেউ যেন আমার দিকে এগিয়ে আসছে। একটা ভয়ানক আতঙ্কে আমার শরীর যেন অবশ হয়ে গেল! আমি দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পা ওঠাতে পারলাম না। যেন নড়বার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছি। বৃষ্টি জোরে পড়ছিল, সবকিছু ঝাপ্‌সা, আর সেই পায়ের শব্দটা ক্রমেই আমার দিকে এগিয়ে আসছে। ক্রমে বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে একটা মূর্তি অস্পষ্ট আকার নিতে লাগল, তারপর একসময় দৈত্যের মত চেহারার একটি লোক আমার সামনে এসে দাঁড়ালো, তার বাঁ হাতে সেই গালার বাক্সটা। আমি বোবার মত তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। একজন চীনা, সাধারণ চীনাদের চাইতে অনেক লম্বা, চওড়া বুক-কাঁধ। হলদে

মুখে নিষ্ঠুরতার ছাপ ভয়ঙ্কর ভাবে ফুটে উঠেছে। আমার ঘরে সেই পুতুলটার মুখই যেন আমি দেখছি, শুধু পুতুলটা অনেকগুণ বড় হলে যে মানুষের আকার নেবে, আমার সামনে দাঁড়ানো চীনেটা তাই। তার সর্বাঙ্গ সিক্ত, পোষাক থেকে জল ঝরছে। আমার দিকে তীব্র দৃষ্টিতেও তাকালো, রাগে ফেটে পড়তে চাইছে। আমি মনে মনে ঈশ্বরের নাম জপতে লাগলাম, এই বুঝি ও খাপ থেকে তরোয়াল বের করে আমাকে কোপ মারে! ওর হাতটাও তরোয়ালের হাতলের ওপর নড়াচড়া করছে; একটু যেন ওর দোনা-মনা ভাব। কিন্তু আমাকে বোধহয় ও নগণ্য ভেবে মুখে একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গী করে হঠাৎ বড় বড় পা ফেলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পরদিন সকালে বাক্সটাকে যথারীতি আবার আমার টেবিলের ওপর দেখতে পেলাম। তরোয়ালটা লাল হয়ে গিয়েছিল। পরের দিন সংবাদপত্রে আর একটি মর্মান্তিক হত্যার খবর চোখে পড়ল। বলা বাহুল্য, হতভাগ্য ব্যক্তিও একজন ইংরেজ। বোধহয় যে রাত্রে আমি ওকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলাম সে রাত্রের হত্যাটাই ওর জিঘাংসার শেষ বলি।

কিন্তু কর্ণেল বার্টনের ওপর বিজাতীয় বিদ্বেষ বশতঃ তাঁর বংশধরদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য যে হত্যালীলা শুরু হয়েছিল, সেই জিঘাংসা চরিতার্থ হলেও নৃশংস হত্যাকাণ্ড কিন্তু ওখানেই থামে নি। খুনের নেশায় বোধহয় ওই চীনে জল্লাদটা উন্মাদ হয়ে উঠেছিল। নিরীহ লোকও তার তরোয়ালের আঘাতে প্রাণ হারাতে লাগল। নবীন একদিন আতঙ্কগ্রস্তের মত এসে বলল, 'আমাদের পাড়াতেই এক ভদ্রমহিলা তাঁর শোবার ঘরে গভীর রাতে নৃশংস ভাবে খুন হয়েছেন। ভদ্রমহিলা একা ফ্ল্যাটে ছিলেন, তাঁর স্বামী অফিসের কাজে বাইরে গিয়েছিলেন, আর সেই সুযোগে খুনী তার কাজ হাসিল করেছে।

ইতিমধ্যে আমার মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন এসেছে, ওই জল্লাদটা আমাকে যেন যাদুমন্ত্র-বলে বশ করে ফেলেছে। ওর প্রভাব আমি মর্মে-মর্মে অনুভব করি। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের দু'জনের মধ্যে যেন একটা যোগসূত্র গড়ে উঠেছে। প্রতিটি হত্যার পর ও যেন আমার সঙ্গে

উল্লাস করতে চায় আর আমিও ওর গোপনীয়তা রক্ষা করবার প্রয়াস পাই। কখন মাঝ-রাত হবে আর জল্লাদটা জেগে উঠবে,এই প্রত্যাশায় সন্ধ্যের পর থেকেই আমার মধ্যে একটা উন্মাদনা দেখা দেয়।

কিন্তু এরপর থেকে ক্রমশঃ আমি ওর মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করতে লাগলাম। আমার বাড়িতে আশ্রয় নেবার জন্যই আমাকে ওর প্রয়োজন হয়েছিল, কিন্তু এখন ওর মুখের ভাবে ও পরিবর্তনে আমার মনে হতে লাগল আমিও হয়তো আর নিরাপদ নই।

'আমি পুতুলটার মুখে যেন একটা বিদ্রূপের আভাষ লক্ষ্য করলাম। গভীর রাত্রে রক্তের নেশায় ও বেরিয়ে পড়ত,ফিরে আসার পর সাফল্যের আনন্দে ওর মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো,আমরা দু'জনে হাসাহাসি করতাম। এখন কিন্তু আর ও আমার সঙ্গে হাসাহাসি করে না,আমাকে লক্ষ্য করেই হাসে বটে,কিন্তু সেটা উপহাসের হাসি। সেই হাসির মর্ম বুঝতে আমার দেরি হয় না,বুঝতে পারি আমারও দিন ঘনিয়ে এসেছে।

কিন্তু জহ্লাদটা আমার বিচার-বুদ্ধিকে আমল না দিয়ে ভুল করেছিল। রাত বারটার পর ও অজেয় হয়ে ওঠে, কিন্তু ভোর থেকে রাত বারটা পর্যন্ত ও যে অসহায় পুতুল ছাড়া আর কিছু নয় এ সত্যটা আমার কাছে আর গোপন ছিল না। আমি স্থির করলাম ও আঘাত হানবার আগেই ওকে ধ্বংস করতে হবে।

নবীনকে আমি ক'দিনের ছুটি দিলাম। এক সন্ধ্যায় বেশ কিছু শুক্‌নো কাঠ দিয়ে আমি আমার চুল্লিটায় আগুন জ্বালালাম। আগুন বেশ ভাল রকম জ্বলে ওঠার পর আমি লাক্ষার বাক্সটা সেই ঘরে নিয়ে এলাম। শয়তানটাকে একবার শেষ দেখার প্রলোভন আমি সংবরণ করতে পারলাম না। ডালাটা খুলে আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম। ওর মুখে সেই এক অশুভ অভিব্যক্তি, এতটুকুও বদলায়নি। বাক্সর ডালাটা বন্ধ করে আমি ওটাকে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে নিক্ষেপ করলাম। লাক্ষার বাক্স মুহূর্তের মধ্যে জ্বলে উঠল।

লেলিহান আগুনের শিখায় জীবন্ত দগ্ধ প্রাণীর মতই যেন ও ছট্‌ফট্‌ করছে। ও চীৎকার করে উঠল, এক ক্ষীণ শব্দ আমার কানে ভেসে

এল, তারপর পুতুলটা ভস্মে পরিণত হ'ল। চামড়া পোড়ার একটা কটু গন্ধ আমার নাকে এসে লাগল। আমি ঘরের সব জানলাগুলি খুলে দিলাম, মুক্ত বাতাস ঘরে ঢুকতেই অনেকদিন পরে আমি নিজেকে মুক্ত, স্বাধীন অনুভব করলাম।

হঠাৎ একটা সত্য আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। এতদিন প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে আমি যেন নিজেকে ওর জঘন্যতম অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছি, এ কথা আমি কোনমতেই অস্বীকার করতে পারি না।

সে-রাত্রে আমি এক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম, ওই শয়তানটা যত লোককে হত্যা করেছে তাদের সকলের হৃৎপিণ্ডের রক্ত একটা গামলায় ভরা হয়েছে, তারপর কেউ যেন সেই রক্তে বার বার আমাকে হাত ধুতে বাধ্য করছে, আমার দু'হাত রক্তে রাঙ্গা হয়ে উঠেছে। সকাল-বেলা ঘুম থেকে উঠে সেই দুঃস্বপ্নের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে আমি যেন হাপ ছেড়ে বাঁচলাম। হঠাৎ নিজের হাতের দিকে আমার দৃষ্টি পড়ল আর একটা হতাশা ও আতঙ্কে আমার গলা দিয়ে একটা আর্ত স্বর বেরিয়ে এলো। দিনের পরিষ্কার আলোয় আমি সভয়ে দেখলাম আমার হাত দু'টো সত্যই রক্তাক্ত মনে হচ্ছে, যেন সদ্য রক্তের মধ্যে হাত ডুবিয়েছি। আমি বাথরুমে ছুটে গেলাম, সাবান দিয়ে খুব ভাল করে দু'হাত ধুয়ে ফেললাম, কিন্তু লাল্‌চে ভাবটা আর কিছুতেই গেল না। আমার অপরাধের জ্বলন্ত সাক্ষী সেই গাঢ় লালিমা আজও আমি দু'হাতে বয়ে বেড়াচ্ছি।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক থামলেন। কিছুক্ষণ পর আমাদের সকলের মুখের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে বললেন, 'আপনারা আমার কথা হয়ত বিশ্বাস করছেন না, ভাবছেন আমি এক গাঁজাখুরি গল্প ফেঁদেছি! হায়রে, তা যদি সত্যি হোত! কিন্তু আমার কাহিনীর এক বর্ণও মিথ্যে নয়, এই দেখুন।' ভদ্রলোক টান দিয়ে দু'হাতের দস্তানা খুলে ফেললেন আর আমরা সবাই সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম, ভদ্রলোকের দু'হাতের আঙ্গুলের ডগা থেকে কব্জি পর্যন্ত লাল্‌চে, যেন এক গামলা রক্তের মধ্যে হাত দু'টোকে ডোবানো হয়েছে।

| ০ |